রাজা মহারাজ

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ)

স্বামী নরোত্তমানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা-৩

মুদ্রাকর
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
এক্সপ্রেস্ প্রিন্টার্স লিমিটেড,
২০এ, গৌর লাহা স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

কার্তিক, ১৩৬১

এক টাকা আট আনা

নিবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসসন্তান এবং লীলাসহচর সাধক-প্রবর সংঘগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দের নাম শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তাঁহার বীরশিষ্য পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দের মত বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে সুপরিচিত নয়। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে স্বামীজী তাঁহাকে নিজের উপরে স্থান দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সমস্ত দায়িত্ব অকুণ্ঠিত-চিত্তে তাঁহাকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন ; 'রাজা মহারাজ' তাঁহারই দেওয়া আদরের নাম। যুগগুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তপস্যার হোমাগ্নিশিখা রাজা মহারাজ নিজ জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অসীম নিষ্ঠার সহিত সাগ্নিক ব্রাহ্মণের মতো যত্নে আজীবন তাহা প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছিলেন এবং শত শত মুমুক্ষু মানব-মানবীর অন্তরে আত্মীয়ের ভালবাসা লইয়া সেই পুণ্যাগ্নিশিখা সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে সাধক এবং সিদ্ধপুরুষ, ধর্মগুরু এবং কর্মবীর, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব সৃষ্টি এবং যুগাদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের অন্যতম স্রষ্টা। তাঁহার পুণ্যজীবন সংঘের সন্ন্যাসী এবং গৃহী ভক্তদের চরিত্র-গঠন-পথের পাথেয় এবং দেশে বিদেশে বহু সাধকের জীবনের ধ্রুবতারা হইলেও সাধারণ বাঙালী তাঁহাকে চিনে নাই।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনী এবং উপদেশাবলী পূর্বে প্রকাশিত হইলেও নূতন করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে। আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ব্যাকুলতা বর্তমান সমাজে দুর্লভ ; উহা

কোনো দিনই কোনো সমাজে সুলভ ছিল বলিয়া মনে হয় না। তথাপি মানুষের অন্তরের সুপ্ত কল্যাণবুদ্ধিকে জাগ্রত করিবার জন্য মহাপুরুষেরা যুগে যুগে সত্য প্রচার করিয়াছেন, দ্বারে দ্বারে জ্ঞান ভক্তি প্রেম বিতরণ করিয়া ফিরিয়াছেন। কাহার মধ্যে কতটা ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে, মহাজীবনের পুণ্যকাহিনী কাহার পক্ষে ঈশ্বরলাভের জন্য কতখানি ব্যাকুলতা জাগাইয়া তুলিবে, তাহা আপাতদৃষ্টিতে সব সময় বোঝা যায় না। সেইজন্য কাহাকেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা সদ্গ্রন্থ এবং সদ্গুরুর সন্ধানে নিজেরা বাহির হইবেন; যাঁহারা মুমুক্ষু নহেন, তাঁহারা কৌতূহলবশে মহাপুরুষের জীবনকথা পড়িয়া দেখিলে কিছু উপকৃত হইবেন। এই বিশ্বাসেই এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। একজন বাঙালীও যদি ইহার দ্বারা সাধনার পথে সাহায্যলাভ করেন, তাহা হইলে প্রচেষ্টা সার্থক হইবে।

গ্রন্থকার আচার্য ব্রহ্মানন্দ স্বামীর একজন নগণ্য সন্ন্যাসী শিষ্য। ব্যক্তিগতভাবে রাজা মহারাজের পুণ্যপ্রভাব নিজ জীবনে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন; সেই ঐশ্বর্যের এবং আনন্দের ভাগ তিনি আর পাঁচ জনকে না দিয়া স্বস্তি পাইতেছেন না; সেইজন্য সাহিত্যিক না হইয়াও তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তিনি কবি-যশঃপ্রার্থী নহেন; উপহাসাস্পদ হইবার ভয় অগ্রাহ্য করিয়া নিজের ভাষার এবং শক্তির দৈন্য জানিয়াই তিনি কর্তব্যের অনুরোধে একাজে হাত দিয়াছেন; সহায়করূপে লইয়াছেন একজন অল্পপরিচিত সাহিত্যিককে। ইঁহার নাম শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থের সৌষ্ঠব-সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই কার্যে গ্রন্থকার পূর্ব-প্রকাশিত নানা গ্রন্থের

সাহায্য লইয়াছেন। সকলের নিকট তিনি কৃতজ্ঞ, সকলের তিনি আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী।

১৬৭।৫ নং ধর্ম্মতলা স্ট্রীট, অনন্তচরণ মল্লিক কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীনন্দকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল।

মহালয়া
১৩৬১ সাল

গ্রন্থকার



এক

কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন, "রাখালের যে রকম বুদ্ধি, তাতে ও একটা রাজ্য চালাতে পারে।" সেই থেকে স্বামীজী তাঁর নাম দিলেন 'রাজা'। মঠের সাধু-সন্ন্যাসী, বাইরের গৃহস্থ-ভক্ত, সবাই ক্রমে 'রাজা মহারাজ' বলে তাঁর উল্লেখ করতে আরম্ভ করলে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর 'রাজা মহারাজ' নামটিই দাঁড়িয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

মস্ত জমিদারের ছেলে রাখাল। বাড়ী ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমায় শিকরা-কুলীনগ্রামে। রাখালের বাবা আনন্দমোহন ঘোষ প্রখরবিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক, অর্থে প্রতিষ্ঠায় বংশমর্যাদায় কুলীন কায়স্থসমাজের মাথা। অপর দিকে মা কৈলাস-কামিনী একান্ত কৃষ্ণানুরাগিণী ভক্তিমতী নারী। তাঁর ধ্যানের ধন 'ব্রজের রাখাল'; তাই বোধ হয় ছেলের নাম রেখেছিলেন 'রাখাল'। ১২৬৯ সালের ৮ই মাঘ, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জন্মে শুক্লপক্ষের শিশুশশীর মতোই রূপে গুণে দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল নবকুমার। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে মা গেলেন ইহলোকের মায়া কাটিয়ে; অত আদরের সন্তানের স্নেহবন্ধনও তাঁকে বেঁধে রাখতে পারলে না। মা গেলেন, কিন্তু মায়ের স্নেহ গেল না। বাবা দ্বিত পক্ষে ঘরে নিয়ে এলেন কলকাতা কাঁসারীপাড়ার শ্যামলাল সেনের মেয়ে হেমাঙ্গিনীকে। বড়ো ঘরের মেয়ে, বড়ো উঁচু তাঁর মন,

বড়ো মিষ্টি তাঁর স্বভাব। মা-হারা শিশুটিকে মায়ের মমতায় বুকে টেনে নিলেন বিমাতা। বাবার বিষয়-সম্পত্তি বেড়ে চলে দিনে দিনে, রাখালের আদরযত্নও বেড়ে চলে। সুখের সংসার, আনন্দময় শৈশব।

বয়স বাড়ে, সেই সঙ্গে বেড়ে চলে রাখালের দেহ-মনের ঐশ্বর্য। সৌম্যসুন্দর রূপে আকৃষ্ট হয়ে পথের পথিক ফিরে চায়। শক্তিতে, সাহসে, খেলাধুলায়, হাস্যকৌতুকে রাখাল অপরাজেয়। সমবয়সী সমস্ত গ্রামের ছেলে তার কথায় ওঠে বসে, তার ইঙ্গিতে চলে; সবার অন্তরঙ্গ, সবার দলপতি সে। এদিকে তার সহজ আকর্ষণ ভক্তির পথে আত্মনিবেদনের দিকে; দেবদেবীর পূজো চলে তার খেলার ছলে। গ্রামের ছেলেদের নিয়ে খেলাঘরে কালীপূজোর আয়োজন হয়। পথে পথে শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে সংকীর্তন করে বড়ো আনন্দে তার দিন কাটে। পূজোর দিনে চণ্ডীমণ্ডপে পুরোহিতের পিছনে বসে থাকে রাখাল মায়ের প্রতিমার মুখে অপলক দৃষ্টি মেলে, ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো। পল্লীপ্রান্তে এক নিবিড় ছায়াঘন পুরাতন দরগায় বালকের দল কীর্তনে মাতে; রাখাল তাদের প্রেরণার উৎস, তাদের দলপতি। আমোদ-আহ্লাদেই বলো, আর পূজা-অর্চনাতেই বলো, রাখাল কিছুতেই পেছ-পা নয়। তার সরল স্বচ্ছন্দ সদানন্দ ভাবটি, মুখের মিষ্টি হাসিটি সঙ্গের সাথী।

আনন্দমোহন বাড়ীর কাছেই পাঠশালা বসিয়ে ছিলেন নিজ খরচে, ছেলের পড়ার জন্য। গাঁয়ের অনেক ছেলে বিনা পয়সায় পড়ত সেই পাঠশালায়। পড়াশোনায় রাখাল ভালই ছিল; বারো বছর বয়সেই সে পাঠশালার পড়া শেষ করলে। আনন্দমোহন দেখলেন ছেলেকে রীতিমতো শিক্ষা দিতে হলে আর গ্রামের

পাঠশালার ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না। ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে গেলেন তিনি। হেমাঙ্গিনীর বাপের বাড়ীতে থেকে ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে পড়ার ব্যবস্থা হল রাখালের। বালক রাখালের জীবনে এই থেকে এক নূতন অধ্যায় শুরু হল। সেটা ইংরেজী ১৮৭৫ সাল।

দুই

কলকাতায় তখন ধর্মবিষয়ক আন্দোলন খুব জোর চলছে। ভারতবর্ষে ইংরেজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্ট-ধর্মের যে বন্যা এসেছিল, তার বেগ মন্দীভূত হলেও একেবারে স্তিমিত হয় নি তখনও। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিদেশী সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দান যা-কিছু, এ দেশে তাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়; আবার ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে, তার সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ধর্মবোধকে পাশ্চাত্যের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য প্রথম প্রচেষ্টাও তিনি আরম্ভ করে যান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যা-কিছু ভালো, তার মিলনই ছিল তাঁর কাম্য। রাখাল যখন কলকাতায় গেলেন তখন রামমোহন নেই, কিন্তু তাঁর শিষ্যধারায় দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীরা পরিপূর্ণ উৎসাহে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারের কাজ চালাচ্ছেন। সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে তাঁদের প্রখর ধীশক্তি এবং আত্মবিশ্বাস আপনভোলা ভারতবাসীকে তাদের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরধর্মের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার পথ দেখাচ্ছিল। একদিকে নব্যসভ্যতার ও পরধর্মের মোহময় আহ্বান, অন্যদিকে শত কুসংস্কার ও দৈন্য-বিড়ম্বিত পঙ্গু সমাজজীবন; এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেদিন যাঁরা বাইরের মোহ ও ভিক্ষার কলঙ্ককে

ঠেকিয়ে ঘরের আবর্জনা পরিষ্কার করবার এবং জীর্ণসংস্কার করবার ব্রত নিয়েছিলেন, আত্মপ্রত্যয়ের দীক্ষা দিয়ে যাঁরা নব ভারতের সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন, স্বভাবতঃই বহু নির্ভীক, ধর্মপ্রাণ যুবক সেদিন তাঁদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন। কলকাতায় নবাগত কিশোর রাখালচন্দ্র ছিলেন সেই বীরযুবকদের অন্যতম।

কেশবচন্দ্রের অসাধারণ ব্যাক্তিত্ব এবং নৈতিক প্রভাব, বিশেষ করে তাঁর অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা রাখালকে মুগ্ধ করে। সত্যান্বেষী রাখাল এইসময় এক পরম বন্ধু লাভ করেন। শুভ সাধনপথের সঙ্গী, চিরদিনের কল্যাণমিত্র নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের) সঙ্গে এই সময়েই তাঁর পরিচয় ঘটে। নরেন্দ্রনাথের সব কিছুই অপূর্ব। অদ্ভুত তাঁর পাণ্ডিত্য, অপরূপ তাঁর প্রেমপূর্ণ হৃদয়, আশ্চর্য তাঁর আধ্যাত্মজীবনের জন্য তীব্র পিপাসা। নরেন্দ্রনাথের লোকোত্তর চরিত্র রাখালচন্দ্রের মনে গভীর রেখাপাত করলে। মণিকাঞ্চন-সংযোগ হল। দুই বন্ধুতে নিয়মিত ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে যোগ দেন, ধ্যানধারণা ও ধর্মালোচনায় তাঁদের সময় কাটে। রাখালচন্দ্রের লেখাপড়ার দিকে আর তেমন মন নেই। নরেন্দ্রনাথ নিরাকার, অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে কেবল তাঁরই উপাসনা করবেন বলে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন; বন্ধুর পরামর্শে এবং উৎসাহে রাখালচন্দ্রও অঙ্গীকারপত্রে সই করলেন।

এরপর চলল নূতন উৎসাহে ঈশ্বরলাভের চেষ্টা। একটু নিরালা জায়গা পেলে হয়—সময় নেই, অসময় নেই, রাখালচন্দ্র চোখ বুজে বসে যান। গঙ্গাস্নানে গিয়ে জলে ডুব দিয়েও চলে তাঁর

ধ্যান। দিনে রাত্রে এক ঈশ্বরচিন্তা ছাড়া তাঁর আর অন্য চিন্তা নেই। পড়াশুনা শিকেয় উঠেছে, স্কুলে দু'দিন যান তো দশ দিন কামাই। বিমাতা হেমাঙ্গিনী মহাভাবনায় পড়লেন। ধর্ম, ধর্ম করে ক্ষেপে যাবে নাকি ছেলেটা? আনন্দমোহনকে চেপে ধরলেন, "ছেলেকে যদি ঘরে রাখতে চাও তো বিয়ে দাও তাড়াতাড়ি।" আনন্দমোহন বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক, বুঝলেন কথাটা ঠিক। পুরানো দড়িতে আর চলছে না, সোনার শিকল চাই। শিকল তৈরির আয়োজন চলল পুরোদমে। শেষ পর্যন্ত বন্ধনের পাকাপাকি ব্যবস্থা হল কোন্নগরের ডাক্তার ভুবনমোহন মিত্রের সেজ মেয়ে বিশ্বেশ্বরীকে দিয়ে। আঠারো বছরের ছেলে রাখালচন্দ্র তখন সবে স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, দশ বছরের মেয়ে বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেওয়া হল। সেটা ইংরেজী ১৮৮১ সাল।

বাপ-মা তো নিশ্চিন্ত হলেন রাখালচন্দ্রের বিয়ে দিয়ে, কিন্তু বিধাতা অলক্ষ্যে হাসলেন। বিবাহ রাখালচন্দ্রের পক্ষে বন্ধনপাশ না হয়ে মুক্তির পথ খুলে দিলে। রাখালচন্দ্রের শাশুড়ী শ্যামাসুন্দরী এবং সম্বন্ধী মনোমোহন দু'জনেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। এই সূত্রে রাখালচন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ হল। দিব্যপুরুষের আধ্যাত্মজীবনের পরিপূর্ণতা চোখে দেখার সৌভাগ্য হল তাঁর। এতদিন রাখালচন্দ্র যাঁদের কাছে যাতায়াত করতেন, তাঁদের প্রতিভা ছিল, পাণ্ডিত্য ছিল, তেজস্বিতা ছিল, কিন্তু পরিপূর্ণতা ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি পূর্ব গুরুরা প্রত্যেকেই ছিলেন অনন্য-সাধারণ-ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ। তাঁদের দীপ্তিতে মুগ্ধ হয়েছিল রাখালের তরুণ হৃদয়; কিন্তু আজ সে তৃপ্তিতে বিগলিত হয়ে গেল।

রাখালচন্দ্রের গুরু বলতে, বন্ধু বলতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই মুমুক্ষু ; ইনি মুক্ত। তাঁরা বলেন, "খুঁজছি, চাই" ; ইনি বলেন, "পেয়েছি, নাও!" নদী অনেক পথ ঘুরে সমুদ্রে এসেছে, আর কি ছাড়ে ? নুনের ডেলা সমুদ্র দেখতে নেমেছে, আর কি ফেরে ?

তিন

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথা কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে চারদিকে অনেকদূর ছড়িয়ে পড়েছে। কেশবচন্দ্র তার আগেই তাঁর স্নেহলাভ করে ধন্য হয়েছেন; তাঁর ব্রাহ্মবন্ধুরা অনেকেই আসেন ঠাকুরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। তাছাড়া সাধুসন্ন্যাসীর নাম শুনলেই আমাদের দেশের লোকের ভক্তি উথলে উঠে সাধু দর্শন করবার, তাঁর কথা শোনবার জন্য; আর, একবার কোনোরকমে সিদ্ধপুরুষের কৃপালাভ করতে পারলে অর্থ এবং পরমার্থ উভয়ই লাভ হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। একঢিলে দুই পাখী মারবার এমন সহজ উপায় আর নেই। ফলে দক্ষিণেশ্বরে যাত্রীর ভিড় বেড়েই চলেছে। বিষয়ী গৃহস্থ ভক্তের দল কেবলই আসে নানা উদ্দেশ্য নিয়ে; ঠাকুর তাদের ফেরাতেও পারেন না, প্রাণে ধরে। ভক্তেরা বলে, ঠাকুর কল্পতরু। শ্রীরামকৃষ্ণ এদিকে গৃহস্থদের ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠছেন। দিবারাত্র তাদের সাংসারিক আলোচনা, তাদের চাকরী, মামলা, রোগ আর বৈষয়িক উন্নতির জন্য নানা রকম প্রার্থনা শুনে শুনে তাঁর কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। প্রাণের জ্বালায় অস্থির হয়ে থেকে থেকে তিনি জগন্মাতাকে ডেকে বলছেন, মা, সংসারী বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জিহ্বা যে জ্বলে গেল। ইচ্ছা করে একটি শুদ্ধসত্ত্ব, ত্যাগী

ছেলে আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা বলে প্রাণ শীতল করি, কান জুড়োই, নিজ উপলব্ধিসকল বলে অন্তরের বোঝা হালকা করি।

মা শুনলেন তাঁর কাতর প্রার্থনা। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে বসে ভাবচক্ষে দেখলেন, মা একটি বালককে হঠাৎ তাঁর কোলে এনে বসিয়ে দিয়ে বলছেন, "এই নাও তোমার ছেলে।" ঠাকুর আতঙ্কে শিউরে উঠে বললেন, "সে কি, মা! আমার আবার ছেলে কি?" তাতে জগন্মাতা হেসে বুঝিয়ে বললেন, এ সাধারণ সংসারী ভাবের ছেলে নয়, এ ত্যাগী মানসপুত্র।

ঠাকুর তখন প্রায়ই ভাবমুখে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত অবস্থায় থাকতেন। সেই অবস্থায় একদিন দেখেন, গঙ্গার বুকে ফুটে উঠেছে একটি পদ্ম, তার ওপর শোভা পাচ্ছেন গোপীজনবল্লভ বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, আর তাঁর হাত ধরে নাচছে একটি নূপুরপরা অনিন্দ্যসুন্দর কিশোর, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজের বন্ধু এক রাখাল! এই দৃশ্য দেখে ঠাকুর আত্মহারা হয়ে ভাবছেন, এ কি দেখলাম!

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই মনোমোহনের সঙ্গে রাখালচন্দ্র ঠাকুরকে দর্শন করতে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। ঠাকুর রাখালকে দেখেই চিনলেন। এই তো তাঁর মায়ের দেওয়া মানসপুত্র, এই তো সেদিনের দেখা শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যসঙ্গী রাখাল ছেলেটি। প্রথম দর্শনের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরের আবেগ মুখে প্রকাশ পেতে দিলেন না, শুধু ভক্ত মনোমোহনকে বললেন, সুন্দর আধার! তারপর রাখালচন্দ্রের সঙ্গে চলল আলাপ। পঁয়তাল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ় হলেন আঠারো বৎসরের যুবকের অন্তরঙ্গ! শ্রীরামকৃষ্ণের বাৎসল্যরসের

স্রোতে কোমলস্বভাব রাখাল ভাসতে লাগলেন। বাড়ী ফিরেও স্বস্তি নেই, কেবলই ঠাকুরের কথা মনে পড়ে, কখন যাব তাঁর কাছে, কখন দেখব তাঁকে, কখন শুনব তাঁর বাণী—দিবারাত্র শুধু এই চিন্তা।

এরপর থেকে রাখালচন্দ্র ফাঁক পেলেই পালান দক্ষিণেশ্বরে; ঠাকুরকে দেখলে তিনি যেমন খুশী হন, ঠাকুরও তেমনি খুশী হন তাঁকে পেলে। রাখাল থেকে থেকে আত্মহারা হয়ে যান ঠাকুরকে মাতৃরূপে দেখে। থেকে থেকে দৌড়ে গিয়ে তাঁর কোলে বসে তাঁর মাই খান, যেন তিন-চার বৎসরের শিশু মায়ের কোলে আশ্রয় পেয়েছেন। বাইরের লোকে দেখে অবাক হয়ে বলে, "এ কি?" বলে তো বলে। ঠাকুরও তাঁর মানসপুত্রটিকে পেয়েছেন, মায়ের স্নেহে তাকে কোলে বসিয়ে ক্ষীর, সর, ননী খাওয়ান, তাকে কাঁধে চড়িয়ে বেড়ান। রাখালের তাতে সঙ্কোচ নেই, ঠাকুরেরও ভ্রূক্ষেপ নেই। রাখাল এলে তো আর বাড়ী ফেরবার নাম নেই, দক্ষিণেশ্বরেই তার দিনের পর দিন কেটে যায়। শ্রীশ্রীমা এই সময় এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে, নহবৎখানার নীচের ঘরে আছেন। ঠাকুর রাখালকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। বললেন, "এই নাও গো—তোমার ছেলে এসেছে।" মা সন্দেশ খাওয়ালেন কত যত্ন করে।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরেই শোন রাখাল। তাঁর খাওয়া, শোওয়া সব বিষয়েই ঠাকুরের সদা সতর্ক নজর। মায়ের মতো ঠাকুর রাখালকে গড়ে তোলেন, আগলে রাখেন।

এদিকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় উঠে গেছে। রাখালের বাবা আনন্দমোহন দুশ্চিন্তায় অস্থির। "জোয়ান ছেলে, বিয়ে যা করলি, দুদিন শ্বশুরবাড়ী গিয়ে আমোদ-আহ্লাদ কর, দুটো ভাল-

মন্দ সখের জিনিস কিনবি, কেন। তা নয়, কোথায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে এক আকাট মুখ্খু সন্ন্যাসীর চেলা হয়ে পড়ে রইলি! না করলি লেখাপড়া, না বুঝলি বিষয়সম্পত্তি। এর পর বৈরাগী হয়ে দোরে দোরে ভিক্ষে করে দিন কাটবে।"

রাখালকে কাছে ডেকে অনেক বোঝালেন আনন্দমোহন, অনেক বকলেন। শাসিয়ে দিলেন, এর পর তাঁকে না জানিয়ে দক্ষিণেশ্বরে গেলে ভালো হবে না। হবে না তো হবে না; বাপের কথা রাখালের এ কান দিয়ে ঢুকল, ও কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। পড়া-শোনায় যে আর মন বসে না! বড়োর ডাক এসেছে, ছোটোতে যে আর প্রাণ ভরে না!

রাখাল আনন্দমোহনের নিষেধ সত্ত্বেও দক্ষিণেশ্বরে যান, গেলে আর ফিরতে চান না। আনন্দমোহন ধৈর্য হারালেন। এত বড়ো স্পর্ধা ঐটুকু ছেলের? তাঁরই খাবে, তাঁরই পরবে, আবার তাঁরই ইচ্ছাকে পায়ে মাড়িয়ে চলবে নিজের ইচ্ছামতো? রাখালকে বন্ধ করা হল বাড়ীতে, দরজায় তালা পড়ল। কক্ষে বন্দী রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তায় বিহ্বল। ওদিকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের বিরহে ব্যাকুল; কি হল তাঁর গোপালের, কেন সে আর আসে না? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করেন, কেই বা খবর রাখে? শেষে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মত্তের মতো ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, "মা, রাখালকে না দেখে আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে, আমার রাখালকে এনে দে।" যুগদেবতা কাঁদছেন ভক্তের বিরহে মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের মতো। এ লীলা কে বুঝবে?

এর মধ্যে সুযোগ মিলল একদিন। আনন্দমোহন নানা বৈষয়িক

দুশ্চিন্তায় অসতর্ক ছিলেন। তিনি কয়েক দিন লক্ষ্য রাখেন নি, রাখালের পাহারায় শৈথিল্য ঘটেছে। রাখাল দরজা খোলা পেয়ে বেরিয়ে পড়লেন, চোঁচা দৌড়, এসে উঠলেন দক্ষিণেশ্বরে। দেখলেন প্রেমের ঠাকুর অপেক্ষা করে পথ চেয়ে আছেন তাঁরই জন্য। ঠাকুর মানসপুত্রকে বুকে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। মহানন্দে ভগবচ্চিন্তায় এবং ধর্মালোচনায় দিন কাটতে লাগল আবার।

এদিকে আনন্দমোহন এক জটিল মামলায় পড়েছেন। জেতবার কোনই সম্ভাবনা নেই। বড়ো বড়ো উকিল ব্যারিষ্টার একবাক্যে বলছেন কোন আশা নেই; তবু আনন্দমোহন মামলা চালাচ্ছেন জেদের বশে, নিজের ক্ষতি করেও কেবল শত্রুকে জব্দ করবেন বলে। এমনি সময় রাখাল পালালেন বাড়ী থেকে; সঙ্গে সঙ্গে যা আনন্দমোহনের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল তাই ঘটল—হারের মামলায় জিত হল। আনন্দমোহন ভেবে দেখলেন, একমাত্র মহাপুরুষের কৃপা ছাড়া এরকম অঘটন ঘটতে পারে না, এ তাঁর ছেলের সাধুসঙ্গের ফল। লোকে তো বলে দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষের অলৌকিক শক্তির কথা, এবার তাঁর মনও সায় দিল। ভেবে দেখলেন, তিনি রাখালকে বিয়ে দিলেন সংসারী করবেন বলে, অথচ শ্বশুরবাড়ীর সূত্রেই রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নেহলাভ করে সংসারকে উপেক্ষা করছে। ঠাকুরের কৃপালাভ ভাগ্যের কথা; হয়তো মকদ্দমায় জয়লাভ রাখালেরই পুণ্যে। মনটা তাঁর নরম হল। রাখালের অবাধ্যতার জন্য রাগটা কমে গেল। কিন্তু সে যে তাঁর কুলপ্রদীপ, তার আশা কি ছাড়তে পারেন? আজন্ম সুখে লালিত তাঁর সন্তান, না জানি দক্ষিণেশ্বরে সে কত কষ্টে দিন কাটাচ্ছে!

আনন্দমোহন নিজেই চললেন দক্ষিণেশ্বরে। রাখালকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে। ঠাকুর তাঁকে দূর থেকে দেখেই তাঁর পরিচয় বুঝতে পেরেছেন। রাখালকে ডেকে বললেন, "ওরে রাখাল, ঐ তোর বাবা আসছে বুঝি, দেখ দেখি!" আনন্দমোহনকে আসতে দেখে রাখালের মুখ শুকিয়ে গেল, ভয় পেলেন; ভাবলেন, এইবার বোধ হয় বাবা আমাকে ঠাকুরের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবেন। ঠাকুর তার মনের ভাব বুঝে বললেন, "ভয় কি রে? মা-বাপ প্রত্যক্ষ দেবতা। তোর বাপ এলেই তুই ভক্তিভাবে প্রণাম করবি; অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মা ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন?"

বলতে বলতে আনন্দমোহন এসে তাঁদের সামনে দাঁড়ালেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আদর করে তাঁকে কাছে বসালেন। রাখাল তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে উঠতেই ঠাকুর আনন্দমোহনকে বললেন, "আহা! আজকাল রাখালের স্বভাটি কেমন হয়েছে! ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে, মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে। অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ করে কিনা, তাই। ···যদি বল বিষয়ীর ঘরে জন্ম, বিষয়ীদের মধ্যে থাকা, তবু এমন ভক্তি, এমন জ্ঞান হয় কেমন করে? তার মানে আছে, যেমন ওল, তার মুখিটিও ভাল হয়। তা রাখাল যে এখানে আসে, তাতে কি তোমার অমত আছে?"

আনন্দমোহন চতুর ব্যক্তি। দেখলেন মহাপুরুষের চারিদিকে বহু সম্ভ্রান্তলোকের ভিড়, বড়ো বড়ো উকিল ও হাকিমের নিত্য সমাগম; এঁকে খুশী রাখলে কাজ দেবে, হয়তো ছেলের সূত্রেই

এইসব লোকের সাহায্য এবং সুপরামর্শ নিখরচায় মিলবে। সুতরাং সুর পালটে গেল। আনন্দমোহন বললেন, "সে কি মশায়! রাখাল আপনার কাছেই থাক, তবে মন বড়ো অস্থির হয়, মাঝে মাঝে তাকে আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন।" আনন্দমোহন সত্যই বিস্মিত হয়েছিলেন রাখালের প্রতি ঠাকুরের গভীর ভালোবাসার পরিচয় পেয়ে। এত বড়ো বড়ো লোক যাঁর ভক্ত, তিনি যে তাঁর ছেলেটিকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন, একেবারে অন্তরঙ্গ করে নিয়েছেন, এতে কোন্ বাপেরই না আত্মপ্রসাদলাভ হয়? রাখালের প্রতি আদর-যত্নও দেখলেন আনন্দমোহন, এত আদর-যত্ন তাঁর বাড়ীতেও হয় কিনা সন্দেহ। রাখালের প্রসন্ন মুখ দেখে মনে হল বড়ো সুখে আছে সে। তাকে জোর করে নিয়ে যেতে তাঁর মন বিমুখ হল, তিনি একাই ফিরে গেলেন। রাখালও ঠাকুরের অসীম কৃপার কথা স্মরণ করে আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রইলেন।

এর মধ্যে একদিন রাখালের শাশুড়ী এলেন ঠাকুরকে দেখতে। আর কয়েকজন মহিলাভক্ত এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে, তাঁদের মধ্যে রাখালের স্ত্রী বিশ্বেশ্বরীও ছিলেন। ঠাকুর দেখলেন তাঁকে ভালো করে। তাঁর সংস্পর্শে রাখালের ভগবদ্ভক্তির কিছু হানি হবে কিনা বোঝবার জন্যই পরীক্ষা করে দেখলেন। বধূর কায়িক লক্ষণ দেখে ঠাকুর সন্তুষ্ট হলেন, বললেন, "মেয়েটি সুলক্ষণা, ঈশ্বর-লাভে স্বামীর সহায়তা করবে।" শ্রীশ্রীমা তখন নহবৎখানার নীচের তলায় রয়েছেন। ঠাকুর বিশ্বেশ্বরীকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বলে পাঠালেন, "টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখা হয়।"

শ্যামাসুন্দরী তাঁদের সঙ্গে রাখালকে যাবার জন্য বার বার পীড়াপীড়ি করলেও রাখাল গেলেন না। এই দিনের ঘটনা সম্বন্ধে ঠাকুর পরে বলেছিলেন, "রাখাল তখন ঘরের ছেলের মতো আছে। জানি আর সে আসক্ত হবে না। বলে, 'ওসব আলুনি লাগে'।"

চার

ঠাকুরকে পেয়ে রাখাল জগৎ ভুলেছেন, ঠাকুরও রাখালকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। রাখালকে কখনও কোলে করেন, কখনও কাঁধে করে নাচেন। কখনও মায়ের মতো যত্ন করে খাবার মুখে তুলে দেন, কখনও শিষ্যের মতো যত্ন করে শিক্ষা দেন। কত কথা শেখান, সাধনপথের কত গূঢ় রহস্য। বলেন, "ছাখ, তাঁকে দর্শন করতে হলে সাধনা দরকার। আমাকে কত কঠোর সাধন করতে হয়েছে। বেলতলায় কত রকম সাধনা করেছি। গাছতলায় থাকতুম। 'মা দেখা দে' বলে চোখের জলে গা ভেসে যেত। সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়, তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কান হয়, সেই চক্ষে তাঁকে দেখা যায়, সেই কর্ণে তাঁর বাণী শোনা যায়।" শুনতে শুনতে রাখালের রোমাঞ্চ হয়। ঠাকুরের নির্দিষ্ট পথে এর পর রাখাল আসন করে বসে ধ্যানজপাদি করেন। দিনের পর দিন যায় ব্যর্থ চেষ্টায়, কিছুই লাভ হয় না। মনে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই। শূন্যতার এবং শুষ্কতার একটা প্রবল অনুভূতি তাঁর মন অধিকার করে বসেছে। 'দুত্তোর' বলে রাখাল ধ্যানজপ সব ছেড়ে দিলেন। কি হবে মিথ্যে ভণ্ডামি করে, মনেই যদি সাড়া না জাগল, ঈশ্বরানুভূতির আনন্দই যদি না পেলুম? স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন রাখাল। রামলাল,

লাটু, হরিশ, এঁদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে সময় কাটতে লাগল। যে ছিল ছায়ার মতো ঠাকুরের নিত্যসহচর সে আর পারতপক্ষে ঠাকুরের ছায়া মাড়ায় না, তাঁকে সাধ্যমতো এড়িয়ে চলে। ঠাকুর তাঁর এই ভাব লক্ষ্য করলেন। একদিন কাছে ডেকে বললেন, "কিরে, তুই যে আর ধ্যানজপ করতে বসিস না?" রাখাল তখন বেপরোয়া, না-পাওয়ার বেদনায় তাঁর সাধনমার্গের প্রতি বিতৃষ্ণা এসেছে, পরমপূজ্য পরমপ্রিয়ের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে তাঁর বাধল না। বললেন, "কিছুই দর্শন হয় না, প্রাণে কোন ভাবের উদ্দীপনা হয় না, শুধু শুধু একটা শুক্‌নো কাঠের মতো বসে থেকে কি হবে?" ঠাকুর চুপ করে শুনলেন তাঁর কথা, বুঝলেন তাঁর দুঃখ। বললেন, "সে কিরে! খুব রোখ চাই, তবে সাধন হয়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দরকার। তাঁর নামবীজের খুব শক্তি, অবিদ্যা নাশ করে। দেখিস নি, বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে, মাটি ফেটে যায়। কামিনী-কাঞ্চন ও বিষয়কথার ভেতর থাকলে মন বড়ো টেনে নেয়, সাধনে থাকতে হয়। ত্যাগীদের এত ভয় নেই; কিন্তু ঠিক ঠিক ত্যাগী কামিনী-কাঞ্চন বা অন্ত প্রসঙ্গ থেকে তফাতে থাকে। সাধন-ভজন থাকলে তবে মানুষ সর্বদা ঈশ্বরে মন রাখতে পারে। হো হো করে বেড়ালে কি হবে? ছিঃ, অমন আর করিস নি, ঠিক সময় মতো বসবি।"

রাখাল ঠাকুরের ভর্ৎসনায় এবং উপদেশে আবার সাধন-ভজনে মন দিলেন। স্থির করলেন, আর একা নয়, এবার ধ্যানে বসবেন ঠাকুরের কাছেই! শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিদিনের মতো মন্দিরাভ্যন্তরে ৺ভবতারিণীর কাছে আসনে গিয়ে বসলেন, রাখাল তাঁর পিছনে

২

পিছনে গিয়ে নাটমন্দিরে বসে রইলেন মায়ের শ্রীমূর্তির দিকে চেয়ে। সন্ধ্যারতি হয়ে গেল, লোকের ভিঁড় খালি হয়ে গেল। রাখালচন্দ্র চেয়ে আছেন তো চেয়েই আছেন। সহসা দেখলেন মায়ের গর্ভমন্দিরটি যেন এক অপরূপ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ক্রমে সেই জ্যোতিঃ বাড়তে লাগল, মনে হল একসঙ্গে যেন স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ শত সূর্য উঠছে মন্দিরমধ্যে। ক্রমে সেই আলৌকিক জ্যোতিঃ মন্দির-দ্বার পার হয়ে তাঁর দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে লাগল। মনে হল সেই অনৈসর্গিক জ্যোতিঃপ্রবাহ যেন ছুটে আসছে তাঁকে গ্রাস করতে। ভয়ে দিশাহারা হয়ে রাখাল আসন ছেড়ে উঠে ছুটতে ছুটতে ঠাকুরের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ঠাকুর যথাসময়ে ঘরে এসে রাখালকে দেখে বললেন, "কিরে, আজ জপ করতে বসেছিলি তো?" লুকিয়ে লাভ নেই, সব কথাই খুলে বলতে হল। সেই অপরূপ আলোর কথা! ঠাকুর বললেন, "এই না তুই বলিস যে যখন ধ্যানজপ করে কিছু দেখতে পাই না তখন শুধু শুধু তা করে কি হবে? আবার দেখলেও পালিয়ে আসবি? তাহলে কি করি বল্?"

রাখাল বুঝলেন নিজের ভ্রম। সেদিন থেকে মনকে দৃঢ় করলেন। নিয়মিত ধ্যানজপ করতে বসেন। তীব্র থেকে তীব্রতর হয় তাঁর সাধনা। ঠাকুর তাঁকে উৎসাহ দেন। বলেন, "পাশের ঘরে রত্ন রয়েছে জেনে ডাকাত কি চুপ করে শুয়ে ঘুমুতে পারে? কি করে রত্ন পাওয়া যায় অহর্নিশ সেই চিন্তা। যখন জানলুম অন্তরে সেই রত্ন রয়েছে, তখন কি আর আমিও খেতে, শুতে, ঘুমুতে পারতুম? দিনরাত শুধু সেই রত্নলাভের জন্য ব্যাকুল

হয়ে বেড়াতুম। ঘরের ভিতরের রত্ন যদি দেখতে চাস আর নিতে চাস, তাহলে খুব পরিশ্রম করে চাবি নিয়ে দরজার তালা খুলতে হয়। তারপর রত্ন বার করে আনতে হয়। তা ছাড়া তালা-দেওয়া ঘরের দ্বারে বসে ভাবলে তো শুধু হয় না, এই আমি দরজা খুললুম, সিন্দুকের তালা ভাঙলুম, এই রত্ন বার করলুম। সাধনা দ্বারা বস্তু লাভ করা চাই। তীব্র ব্যাকুলতা হলে ঈশ্বরলাভ হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণায় রাখালের সাধনা যতই এগিয়ে চলে, ততই আসে নিত্য নব অনুভূতি এবং দর্শনের আনন্দ। মাঝে মাঝে বাহ্য চেতনা হারিয়ে ভাবসমাধিতে মগ্ন হয়ে যান রাখালচন্দ্র। ঈশ্বরলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা এলে তখন আর কিছুই ভালো লাগে না। নীরস মরুভূমি মনে হয় সংসারটাকে, বিস্বাদ মনে হয় লোকসঙ্গ। এমন কি, যে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য রাখাল সমাজ, সংসার, পিতৃস্নেহ, যুবতী পত্নীর প্রেম, সব ছেড়ে এসেছেন, যিনি একাধারে তাঁর গুরু, মাতা, পিতা এবং সখা, সেই প্রেমময় ঠাকুরের সঙ্গও তাঁর ভালো লাগে না। ঈশ্বরলাভের জন্য এই ব্যাকুলতাই রাখালের পরবর্তী জীবনের তীর্থপথে ধ্রুবতারারূপে জেগেছে। ঠাকুর বলেছেন, "রাখালের এমনি হয়েছে যে তাকে আমায় জল দিতে হয়, সেবা করতে হয়।

এই সময়ে রাখালচন্দ্রের মনে একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক অধিকার-লাভের ইচ্ছা জেগে ওঠে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ঠাকুর ইচ্ছা করলেই তাঁকে সাহায্য করতে পারেন সেই আনন্দলোকে পৌঁছোতে। একদিন ঠাকুরের গায়ে তেল মাখাতে মাখাতে তিনি জানালেন তাঁর প্রার্থনা। ঠাকুর তাতে যে শুধু মত দিলেন না তাই নয়, এমন একটি কঠোর কথাও তাঁকে বললেন যে, অভিমানী রাখালচন্দ্র

ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলেন। ছুড়ে ফেলে দিলেন তাঁর হাতের তেলের বাটিটা! হন্ হন্ করে বেরিয়ে চললেন তিনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ছেড়ে। কিন্তু বেশী দূর যেতে হল না, হঠাৎ পা দু'টি অবশ হয়ে গেল। বুঝলেন ব্যাপার। ঠাকুরের শক্তির কাছে হার মানতে হল। ফিরে এসে সামনে দাঁড়াতেই শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "কিরে, গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারলি?" রাখালের মুখে কথা নেই।

কবীর বলছেন, "মুক্তি মুফ্ত নেহি লেঙ্গে।" সাধনা সম্পূর্ণ না হলে সিদ্ধির ফল স্থায়ী হয় না, বিনা চেষ্টায় পরের দয়ায় যা আসে তার মূল্য কি? রাখাল যে আনন্দময় অনুভূতির রাজ্যে সর্বদা বিচরণ করবার জন্য ঠাকুরের দিব্যশক্তির সাহায্য চেয়েছিলেন; ঠাকুর চেয়েছিলেন রাখাল নিজের সাধনার শক্তিতে যেন সেই রাজ্যের অধিকার লাভ করেন—সাধনা দ্বারা সেই অলৌকিক আনন্দের ক্ষণিক অনুভূতি বিস্তৃতি লাভ করতে করতে ক্রমে যেন তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়। সদ্‌গুরু প্রতীক্ষায় ছিলেন সেই সুদিনের। বললেন, "এখানকার শরতের জল নয় যে হুড় হুড় করে আসবে আবার হুড় হুড় করে চলে যাবে।" বুঝলেন রাখাল, আবার মুখ বুজে কোমর বেঁধে সাধনায় লেগে গেলেন। যত বড়ো মহাপুরুষই হোন না কেন জীবদেহ নিলেই সেই দেহের ভুলভ্রান্তি এক-আধ বার আসবে প্রত্যেকের জীবনে। শ্রীরামকৃষ্ণ তা'বলে রাখালচন্দ্রের শক্তিকে ছোট করে দেখেন নি একদিনও। বলেছেন, "নরেন্দ্র, রাখাল এরা নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি, এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ।" আবার অন্যপ্রসঙ্গে বলছেন, "রাখাল নিত্যসিদ্ধ, জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত। অনেকের সাধ্য সাধনা করে একটু ভক্তি হয়, এর আজন্ম

ঈশ্বরে ভালোবাসা। যেন পাতাল-ফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়। নরেন্দ্র, রাখাল এরা আমার অন্তরঙ্গ, এদের যত্ন করে সেবা করলে, খাওয়ালে, সাক্ষাৎ নারায়ণকে খাওয়ান হয়।"

রাখালচন্দ্র ঠাকুরের মানসপুত্র, তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির ভাবী উত্তরাধিকারী। তার উপযুক্ত শিক্ষাই তাঁকে দিতে লাগলেন ঠাকুর। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে ৺ভবতারিণীর সামনে রাখালকে পূর্ণাভিষিক্ত করলেন তিনি। অপর দিকে ব্রজলীলামাধুর্যের রসের ধারায়, প্রেমভক্তিতে অভিষেক চলল তাঁর অন্তরে অন্তরে। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দিষ্ট আসন, মুদ্রা, ধ্যানধারণায় রাখাল যোগাসনে বসে পরমাত্মায় সমাহিত হয়ে যেতে লাগলেন ক্রমে। অদ্বৈতভূমির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে বুঝলেন "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।"

স্বামীজী বলতেন, "আধ্যাত্মিকতায় (spirituality-তে) রাজা আমাদের সকলের বড়ো।" কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়।

এদিকে একনিষ্ঠ সাধনভজনে মন চলল এগিয়ে, কিন্তু দেহ তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। রাখালচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর প্রায়ই অসুখবিসুখ হতে লাগলো বলে তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন ঠাকুর। এদিকে আর এক বিপদ। রাখালের মনে দ্বন্দ্ব চলেছে পিতার প্রতি ও পত্নীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে। ঠাকুর প্রথম দর্শনেই রাখালের স্ত্রীর সম্বন্ধে বলেছিলেন, "এ যে দেবীশক্তি!" সেই বিশ্বেশ্বরী দেবীর নীরব আত্মোৎসর্গ রাখালের চিত্তকে ব্যথিত করে তুলছে। মনের কথা খুলে বললেন রাখাল ঠাকুরের কাছে। তারপর থেকে ঠাকুর তাঁকে মাঝে মাঝে বাড়ী পাঠিয়ে দেন। জানেন ধর্মাচরণে স্ত্রী স্বামীকে সাহায্যই করবেন।

পাঁচ

এর কিছুদিন পরে ভক্ত বলরাম বসুর সঙ্গে রাখালও শ্রীবৃন্দাবন গেলেন। ঠাকুরই বললেন যেতে, আবার যাবার পর তাঁকে না দেখেও ঠাকুর অস্থির। রাখালচন্দ্র সেখানেও মাঝে মাঝে জ্বরে পড়েন, ঠাকুরের অদর্শনে তাঁরও মন ব্যাকুল; তবু ব্রজমাধুরীর ও শ্রীরামকৃষ্ণের আলোচনায় বলরাম বাবুর সঙ্গে সময় কাটান কোন রকমে। ঠাকুর কিন্তু কেঁদে ভাসাচ্ছেন, ব্রজের রাখাল আবার ব্রজে, পাছে পূর্বস্মৃতি ফিরে আসে এবং তার শরীর যায়, সদা এই ভয় ঠাকুরের। তাই ঠন্‌ঠনের মা-কালীর কাছে ডাবচিনি মানত করলেন। অধর সেনকে দিয়ে, মাষ্টারকে দিয়ে, রেজিষ্ট্রি চিঠি লেখান; সময়ে খবর না পেলে আকুল প্রার্থনা করেন ৺ভবতারিণীর কাছে, "মা, রাখাল সুস্থ দেহে ফিরে আসুক।"

ঠাকুরের ঐকান্তিক প্রার্থনা ব্যর্থ হল না। রাখালচন্দ্র অনেকটা সুস্থ হলেন বৃন্দাবনে বাস করে। মাষ্টার মহাশয়ের কাছে চিঠি লিখলেন, "এ বেশ জায়গা, সর্বদা ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিতেছে," ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুনে বললেন, "এখন ময়ূর ময়ূরী যে বড়োই মুশ্‌কিলে ফেলেছে।" বোধ হয় ঠাকুরের ভয় বৃন্দাবনের মায়ায় রাখাল জড়িয়ে না পড়েন। যাই হোক, ভক্ত চুনীলাল বসুর কাছে রাখালের কায়িক মঙ্গল সংবাদ পেয়ে ঠাকুর নিশ্চিন্ত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মনোরম বৃন্দাবনের অতীত স্মৃতি এবং বর্তমান শোভা একদিকে রাখালের প্রাণে শান্তি আনে, অন্যদিকে ঠাকুরের স্নেহের স্মৃতি ও তাঁর অদর্শনের দুঃখ তাঁর চিত্তকে ক্ষণে ক্ষণে অশান্ত, ব্যাকুল করে তোলে। তিন মাস এমনি হর্ষবিষাদে কাটিয়ে রাখাল খানিকটা স্বাস্থ্যলাভ করে দেশে ফিরলেন। হারানিধি হাতে পেয়ে ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না।

পত্নীর এবং পিতার সন্তোষের জন্য এইসময় রাখালকে ঠাকুর কিছুদিন বাড়ী গিয়ে থাকতে বললেন। বাড়ীতে আত্মীয়েরা ঠিক করলেন, এই সুযোগ, একে একটা চাকরীতে লাগিয়ে দেওয়া যাক্, তাহলে আর দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারবে না। রাখাল দেখলেন গতিক সুবিধার নয়, সোজা গিয়ে উঠলেন দক্ষিণেশ্বরে। সব কথা শুনে ঠাকুর বললেন, "ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস একথা বরং শুনব, তবু তুই দাসত্ব করিস একথা যেন না শুনি।" রাখালও দৃঢ়কণ্ঠে আত্মীয়দের জানিয়ে দিলেন, "আমায় যদি কেউ হাজার টাকার চাকরী দেয় তবু আমি করব না।"

ছয়

জমি যতই ভালো হোক, চাষ না দিলে তাতে পুরো ফসল ফলে না। রাখাল ঠাকুরের মানসপুত্র, অপরূপ উর্বর ক্ষেত্র, কিন্তু পাকা চাষী শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহজে সন্তুষ্ট হবার পাত্র নন। আবাদ না করলে যে সোনা ফলবে না, তা তিনি জানেন। সার দিয়ে, লাঙল দিয়ে, নিড়িয়ে, সেচ দিয়ে সেই ক্ষেত্রের পরিপূর্ণ শক্তিকে উদ্বোধিত না করে তিনি ছাড়বেন না, ভবিষ্যতের শস্যভাণ্ডারে এক কণা যাতে কম না পড়ে। ঠাকুরের স্নেহও যেমন বিচিত্র, শাসনও তেমনি বিচিত্র। এমনি তো রাখাল বলতে অজ্ঞান—তিনি জানেন রাখাল সত্যিই ব্রজের রাখাল; যশোদার মতো বাৎসল্যে বিগলিত-চিত্তে রাখালচন্দ্রের মুখে ক্ষীর-সর-ননী তুলে দিয়ে তিনি বাল-গোপালের পূজার স্বাদ পান। অন্য কেউ রাখালকে বকলে তাঁর প্রাণে সহ্য হয় না, অন্যে ফরমাশ করলে বাধা দেন। বলেন, "রাখালের দোষ ধরতে নেই, ওর গলা টিপলে দুধ বেরোয়।" "আহা! ও দুধের ছেলে, ওকে তোরা কোনও কাজ করতে বলিস নি।" এমনি সব আদর-দিয়ে-মাথায়-তোলা কথা। আবার নিজে যখন বকেন তখন কাঁদিয়ে ছাড়েন। পান সাজা নেই, ঠাকুর ভাত খেয়ে উঠে বললেন, "ওরে রাখাল, পান সাজ না, পান নেই যে।" মানসপুত্রের সাফ জবাব, পান সাজতে জানি নে, মশাই।" ঠাকুর হেসেই আকুল। "সে কিরে?

পান সাজবি, তার আবার জানাজানি কি, যা পান সেজে আন।" "পারব না, মশাই।" লাটু মহারাজ কাছেই ছিলেন। কাটখোট্টা মানুষ, রাখালের অবাধ্যতায় বিরক্ত হয়ে ধমক দিলেন। রাখালের মেজাজটিও কম নয়, জোর তর্ক বেধে গেল। ঠাকুরের মহা আনন্দ ঝগড়া দেখে; রামলালকে ডেকে প্রশ্ন করলেন, "বল্ তো কে বেশী ভক্ত?" ঠাকুরের মন বুঝে রামলাল বললেন, "মনে হয় রাখালই বেশী ভক্ত।" ঠাকুর হেসে বললেন, "ঠিক বলেছিস।' দেখছিস না, রাখাল কেমন হেসে হেসে কথা বলছে, আর লেটো কি রেগে গেছে।" অর্থাৎ তাঁর বিচারে গুরুর সামনে রাগ করাটাই লাটুর হল অভক্তির লক্ষণ, আর গুরুকে অমান্য করলে যে, তার সাত খুন মাপ। অবশ্য পরে ঠাকুর লাটুকে আসল কথাটা বুঝিয়ে বলেছিলেন, "পান খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল দেহের, তাই রাখাল অমান্য করতে পেরেছে। দেহের ভিতর যিনি, তাঁর ইচ্ছা হলে রাখালের সাধ্য ছিল না যে অমান্য করে।" ঝগড়ার পরে লাটুই সেদিন পান সেজে দিলেন। এই গেল ঠাকুরের প্রশ্রয়। আবার এর উল্টো দিকও আছে। পথ থেকে রাখাল একটা পয়সা কুড়িয়ে নিয়েছেন—কোন লোভের বশে নয়, জিনিসটা নষ্ট হচ্ছে, কোন গরীব-দুঃখীকে দিলে তার উপকার হবে, এই ভেবে। ঠাকুর বিরক্ত হলেন, ধমক দিয়ে বললেন, "যে মাছ খায় না, সে মাছের বাজারেই বা যাবে কেন? তোর যখন নিজের দরকার নেই তখন তুই কেন ও পয়সা ছুঁতে গেলি?"

কালীমন্দিরের প্রসাদ এসেছে। রাখালের একে ছেলেমানুষি যায় নি, তার ওপর সেদিন তিনি ছিলেন ক্ষুধার্ত। বলা নেই, কওয়া

নেই, টপ করে তা থেকে মাখনের ডেলাটি মুখে ফেলে দিয়েছেন। আর যায় কোথা! ঠাকুর ভীষণ চটে গেলেন। বললেন, "তুই তো ভারি লোভী! এখানে এসে কোথায় লোভটোভগুলো ত্যাগ করবি, তা না, আপনি তুলে নিয়ে খেলি?" রাখালের তখন খাওয়া মাথায় উঠে গেছে, মাখনের ডেলা গলা দিয়ে আর নামতে চায় না। মুখ শুকিয়ে গেছে বেচারীর, লজ্জায় অপমানে টপ্ টপ্ করে চোখের জল ঝরে পড়ছে দু'গাল বয়ে। ঠাকুর নিষ্করুণ, এখানে তাঁর মনে কোন দুর্বলতা নেই, ক্ষমা নেই তাঁর ভক্তের দুর্বলতায়। এমনি করেই চলেছিল 'মানব-জমীনের আবাদ'। ঠাকুর বলতেন, "এখানকার যারা আপনার লোক, তারা বকলেও আসবে।" রাখাল তাঁর অধ্যাত্মসম্পদের উত্তরাধিকারী, তাঁর অন্তরের যজ্ঞাগ্নিশিখার ভবিষ্যৎ বাহক; মানসপুত্রকে পিতৃধন দেবার আগে এ হল তার প্রস্তুতি। আধার যেন ভঙ্গুর না হয়; সহস্র বিপদে ও প্রলোভনের ঝঞ্ঝায় যেন অবিচল থাকে তার প্রাণের পূজাদীপশিখা।

যুগান্তরে যুগদেবতা মহাপুরুষ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে দেখা দেন; তাঁর পুণ্যপ্রভায় আলোকিত হয়ে ওঠে আধ্যাত্ম জগৎ। সুদূর, সীমাহীন দেশ ও কাল সেই আলোর দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে রাখবার জন্য প্রয়োজন হয় তাঁর পার্ষদদের—সূর্যের যেমন প্রয়োজন হয় গ্রহ-উপগ্রহদের। আলোকবিকীরণকারী মহাজ্যোতিষ্কের রশ্মিমালা নিজ নিজ হৃদয়মুকুরে প্রতিফলিত ক'রে এইসব উত্তরসাধকেরা তাঁদের দেশকে, সমস্ত পৃথিবীকে বহুযুগের জন্য সমুজ্জ্বল ক'রে রাখেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নবযুগের সেই মহাদ্যুতি; নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি পার্ষদেরা তাঁর সেই লোকোজ্জীবনী দীপ্তিকে দিগ্‌দিগন্তে বিচ্ছুরিত

করবার ভার নিয়েই এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্ক কোন লৌকিক বা দৈবিক বন্ধন নয়; আত্মার আত্মীয় তাঁরা, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁরা ঠাকুরের।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুখনো ভাব দেখতে পারতেন না। তাঁর তত্ত্বকথায় থাকত সাহিত্যের মাধুর্য, তাঁর শিক্ষায় থাকত বয়স্থের রঙ্গরস। নিমন্ত্রিত হয়ে গুরুশিষ্যে গেছেন কোন অনুরাগীর বাড়ী ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতে। ভজনাদির পর খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। গৃহকর্তারা নিজেদের আত্মীয়স্বজন এবং ধনী মানী বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত, এঁদের আর কেউ খোঁজ নিচ্ছে না। ঠাকুর হেসে বললেন, "কইরে, কেউ ডাকে না যে!" রাখাল বড়ো ঘরের ছেলে, বড়মানুষি চাল ঢের দেখেছেন, আত্মসম্মান জ্ঞানটি তাঁর টন্‌টনে। বললেন, "মশাই, চলে আসুন।" কিন্তু ঠাকুরের কাছে মান-অপমান নেই; হেসে বললেন, "আরে রোস, গাড়ীভাড়া তিন টাকা দু'আনা কে দেবে? পয়সা নেই আবার ফাঁকা রোক! আর এত রাত্রে খাই কোথা?" কথাটা মনঃপূত হল না, রাখাল গুম হয়ে রইলেন। পরে যখন খাওয়ার জন্য ডাক এলো তখন আসন সব ভর্তি, অতি কষ্টে একটা অপরিষ্কার জায়গায় ঠাকুরকে খেতে বসানো হল। দক্ষিণেশ্বরে ফেরবার পথে ঠাকুর গাড়ীতে আসল কথা ভাঙলেন। বোঝালেন, গৃহস্থেরা অজ্ঞানবশতঃ অনেক সময় সাধুর সঙ্গে যথোচিত ব্যবহার করে না, তাতে সাধুর রাগ করতে নেই। সন্ন্যাসীর কর্তব্য সর্বদা সকলের মঙ্গল চিন্তা করা। কিছু না খেয়ে এলে গৃহস্থদের অকল্যাণ হয়, তাই তারা যদি দিতে ভুলেও যায়, তবু সাধুর কর্তব্য অন্ততঃ এক গ্লাস জল চেয়ে খেয়ে আসা।" ঠাকুরও সেদিন সেখানে

গৃহস্থের কল্যাণে খেয়েছিলেন শুধু নুন দিয়ে খান কয়েক লুচি, আর কিছুই নয়। রাখালের চোখ ফুটল। ঠাকুরের সহজই শিক্ষা। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।'

ঠাকুর রাখালকে ভালোবাসেন ছেলের মতো, রাখালেরও বহুদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল ঠাকুর তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর কেউ ঠাকুরের স্নেহে ভাগ বসালে তিনি অভিমানে ফেটে পড়েন। অন্য কাউকে ঠাকুর বেশী ভালোবাসলে ছেলেমানুষের মতো রাগ করেন তিনি। কেউ হয়তো অনেকদিন আসে নি, ঠাকুর অধীর হয়ে উঠেছেন, নিজেই যেতে চান তার বাড়ীতে দেখা করতে। রাখাল আপত্তি করেন, স্পষ্টই বলেন, "ওরা কি সংসার ছেড়ে আসবে, তাই আপনি দেখতে যাবেন?" ঠাকুর রাখালের মন বুঝে চলেন। অন্য ছেলেদের খাবার দিতে হলে বলেন, "তুই খা আর ওদের দে।" ভক্তদের কাছে বলেন. "আমার ভয় করে ওর জন্য। জগদম্বা যাদের এখানে এনেছেন তাদের ওপর হিংসে করে পাছে ওর অকল্যাণ হয়।" পরে রাখাল বুঝেছিলেন; বলতেন, "মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ। তিনি কি কেবল আমাদের জন্য এসেছেন? তিনি সকলের গুরু, প্রভু, আশ্রয়।"

সাত

সংসারের বন্ধন শেয়াকুলের কাঁটা, ছেড়েও ছাড়তে চায় না। রাখালের ভোগ গেল তো শঙ্কা যায় না। ঘরে অন্তঃসত্ত্বা পত্নী বিশ্বেশ্বরী; তাঁর স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামী ছাড়া জগতে তিনি কিছু জানেন না। রাখাল ভাবেন, সংসার ছাড়লে স্ত্রীর কি হবে? ঠাকুর ছুটি দিয়েছেন, বলছেন, "রাখাল এখন পেনসন খাচ্ছে। বৃন্দাবন থেকে এসে বাড়ীতে বাস করছে। তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিয়েছি, একটু ভোগ বাকী ছিল কিনা।" রাখালের দেহ অসুস্থ, বাড়ীর সেবাযত্নের সত্যই দরকার, কিন্তু তাঁর মন পড়ে আছে দক্ষিণেশ্বরে। মনের মধ্যে বড়ো অশান্তি, রাত্রিদিন অন্তর্দ্বন্দ্ব। একদিকে আলোকতীর্থের ডাক, আর একদিকে সাংসারিক কর্তব্যের আহ্বান, পতিত্বের অভিমান। একদিন শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবকে খোলাখুলিই জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার পরিবারের কি হবে?" আঘাত পেলেন ঠাকুর, সে কথার কোনো উত্তরই দিলেন না তখন। সন্দেহ-দোলায়মান চিত্তে রাখাল বাড়ী গেলেন সেদিন। পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর ভক্তদের কাছে বলেন, "সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে, সদাই মনে করে আমি এসব করছি। গৃহ, পরিবার, এ সব আমার। দাঁত ছিরকুটে বলে, এদের কি হবে? আমার স্ত্রী পরিবার কে দেখবে? রাখাল বলে, 'আমার

স্ত্রীর কি হবে ?' " ভক্ত হরমোহন শুনে বিস্মিত হলেন ; রাখালের সম্বন্ধে তাঁর খুবই উঁচু ধারণা ; বললেন, "রাখালও এই কথা বলে ?" রামকৃষ্ণদেব অনেক দেখেছেন, মানব-চরিত্র সম্বন্ধে গভীর তাঁর অভিজ্ঞতা, উত্তেজিত স্বরে বললেন, "তা কি করবে ? যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান।" লোকমুখে সব কথাই রাখালচন্দ্রের কানে গেল। ক্ষমা করেছেন গুরু তাঁর দুর্বলতাকে, কিন্তু সত্যই কি তিনি দুর্বল ? সাধারণ মানুষের মতো সংসারে মত্ত হয়েই কি তাঁর দিন কাটবে ? কে কার স্ত্রী ? কে কার পুত্র ? শরীর সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের দৃঢ়তা ফিরে এল, ফিরে এল তাঁর প্রখর বিচারবুদ্ধি, তীব্র বিষয়-বৈরাগ্য। গুরুবাক্যে বিপুল বিশ্বাস নূতন করে ফিরে পেলেন তিনি। বন্যার বেগে ছিঁড়ে ভেসে গেল সংসারের সমস্ত বন্ধন। রইল অন্তঃসত্ত্বা পত্নী তার রূপ-গুণের সাজানো অর্ঘ্য নিয়ে, ধনিগৃহের ঐশ্বর্য তার সুখ, সম্পদ, যশোমানের সহস্র প্রলোভন নিয়ে। মহামায়ার মোহজাল কেটে বের হলেন রাখাল, স্বগৃহের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসে উঠলেন। কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুর সেবায় আত্মনিবেদন করে শান্ত হল তাঁর চিত্ত, নিরঙ্কুশ হল তাঁর সাধনার জয়যাত্রা।

এদিকে ঠাকুরের কঠিন গলরোগ—ক্যানসার দেখা দিয়েছে। তাঁর সেবার জন্য শ্রীশ্রীমা এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। লাটু এবং হরিশ নিয়মিত থাকেন, রাখালও যোগ দিলেন তাঁদের দলে। রাত্রে পূর্বের মতো ক্যাম্পখাটটি পেতে শুয়ে থাকেন ঠাকুরের কাছে। রোগশয্যার পাশে রাখাল ও নরেন্দ্রকে দেখে ঠাকুরের বড়ো আনন্দ। মাঝে মাঝে, মা যেমন করে ছোট শিশুকে আদর

করে, তেমনি করে আদর করেন, তাদের মুখে চোখে সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দেন।

এই সময়ে একদিন ভক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তীর ইচ্ছা হল ব্রহ্মচক্র রচনা করে সাধনা করবেন। ঠাকুর অনুমোদন করলেন সেই প্রস্তাব। কৃষ্ণা চতুর্দশীর গভীর রাত্রে রাখাল, মাষ্টার, কিশোরী প্রভৃতিকে নিয়ে ধ্যানে বসলেন মহিমাচরণ। ধ্যানে বসেই রাখালের ভাব হল—একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থা। ঠাকুর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে তবে তাঁর সংজ্ঞা ফেরে। দিন দুই পরে ঠাকুর কিছুক্ষণ মৌনাবস্থায় ছিলেন, মৌনভঙ্গে বললেন, "মা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন ভক্তদের কার কতটা হয়েছে।" বাবুরামকে পরে একদিন বলেন, "রাখালের সম্বন্ধে মা কত দেখিয়েছেন! তার অনেক কথা বলতে নিষেধ আছে।"

আট

এদিকে ঠাকুরের কঠিন রোগ দিন দিন বেড়েই চলেছে। ভক্তেরা বিষণ্ণ, চিন্তামগ্ন। চিকিৎসার সুবিধার জন্য তাঁকে দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রথম শ্যামপুকুরে, পরে কাশীপুরে নিয়ে আসা হল। ঠাকুরের সেবার জন্য অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে রাখালও এলেন কাশীপুরের বাগানে। নরেন্দ্র, বাবুরাম, যোগীন্দ্র, লাটু, নিরঞ্জন প্রভৃতি অনেকেই জড়ো হয়েছেন ঠাকুরের রোগশয্যার পাশে। এঁদের যাঁর যা স্বরূপ, দক্ষিণেশ্বরে থাকতে মা জগদম্বা ঠাকুরকে আগেই দেখিয়ে দিতেন। সেই বুঝে তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন ঠাকুর, স্বরূপ অনুযায়ী, প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন প্রত্যেককে। কেউ বা এসে দু'চার দিন থাকতেন তাঁর কাছে, কেউ বা দর্শন করেই চলে যেতেন, কেউ বা ছুটিছাটায় রাত কাটিয়ে যেতেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁদের শুধু যে সাধন-ভজনের ইঙ্গিত করেই ছেড়ে দিতেন তা নয়, হাত ধরে পথে এগিয়ে দিতেন, পাশে বসিয়ে ধ্যানজপ করাতেন নিয়মিত। তাঁর রোগ বাড়লেও এই সাধনার ধারায় ছেদ পড়ল না, দক্ষিণেশ্বরে যে বীজ পোঁতা হয়েছিল, কাশীপুরে তারই অঙ্কুর দেখা দিল ভক্তদের হৃদয়ে। রাখালের মন থেকে এখন সংসারের চিন্তা একেবারে গেছে, কেবল প্রেমময় গুরুর সেবা আর তারই ফাঁকে ফাঁকে দিনে রাত্রে ধ্যানজপ। শ্রীরামকৃষ্ণের রোগমুক্তির

কামনার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে এখন স্বর্গকামনা, মোক্ষকামনা, ত্রৈলোক্যের আধিপত্যকামনা। ঠাকুরের দেহ অসুস্থ, কিন্তু মনে আনন্দ ধরে না। এদের দেখে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান, মুগ্ধ হয়ে যান এদের আন্তরিক সেবায়, শ্রান্তিহীন তপস্যায়। অন্য ভক্তদের কাছে বলেন, "আমি এদের জানি সাক্ষাৎ নারায়ণ; বিবেক, বৈরাগ্য, গুরুবাক্যে বিশ্বাস, এসব থাকলে আর কোনো কষ্ট নাই। তাই নরেন্দ্র, রাখাল, এদের জন্য এত আকুলতা।"

বাঁধন কাটলে কি হবে, পরীক্ষার আর শেষ নেই। এই সময় রাখালের শ্যালক ঠাকুরের পরমভক্ত মনোমোহন একদিন এসে ঠাকুরকে খবর দিলেন, "রাখালের একটি ছেলে হয়েছে।" রাখাল পাশেই ছিলেন, শুনলেন সব কথাই; কিন্তু তখন তিনি নির্বিকার। একটি কথাও বললেন না এবিষয়ে। মনে বোধ হয় একটি আঁচড়ও লাগল না। হীরেতে কি সহজে দাগ বসে? দিনে রাত্রে রোগীর সেবা, ধ্যানজপ যেমন চলছিল চলতে লাগল। কিছুদিন পরে এলেন শাশুড়ী রাখালের নবজাত শিশুটিকে নিয়ে; তাঁর পত্নীও এলেন সেই সঙ্গে ঠাকুরকে প্রণাম করতে। স্নেহের দুলাল, একমাত্র বংশধর, নয়নানন্দকর তার রূপ। রাখাল দেখেও দেখলেন না, তাঁর প্রশান্ত গম্ভীর মুখে ছায়াপাত হল না। তাঁর প্রাণ তখন অমৃতলোকের আস্বাদ পেয়েছে, আর কি নামতে পারে? ঊর্ধ্বমুখী, নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অচলপ্রতিষ্ঠ তখন তাঁর চিত্ত। কে তাঁকে টলাবে? এমনি করেই বুঝি একদিন শাক্যসিংহ রূপসী পত্নী যশোধরা এবং নবজাতপুত্র রাহুলের মোহবন্ধন কাটিয়ে পরমার্থের সন্ধানে পথে বেরিয়েছিলেন। ইতিহাসের ছবি ঘুরে আসে।

ঠাকুরের কাছে শিশুর যত্নের ত্রুটী হল না। খোকাকে আদর সোহাগ করলেন তিনি কোলে করে, তারপর শ্রীশ্রীমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন; বলে দিলেন টাকা দিয়ে যেন মুখ দেখা হয়। এরপর রাখালচন্দ্রের প্রসঙ্গে একদিন ভক্তদের কাছে বললেন, "রাখাল টাখাল এখন বুঝেছে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ। পরিবার আছে, একটি ছেলেও হয়েছে, কিন্তু বুঝেছে যে সে-সবই মিথ্যা, অনিত্য। ও আর সংসারে ফিরে যাবে না।"

এই সময় ঠাকুরের ভক্ত বুড়ো গোপালের ইচ্ছা হয়, সাধুভোজন করাবেন। ঠাকুর বললেন, "কোথায় সাধু খুঁজবে? এইখানেই সব রয়েছে—এই ছোকরাদের খাওয়ালেই হবে।" তাই করলেন বুড়ো গোপাল এবং মালাচন্দন সহ বারোখানি গেরুয়া কাপড় দান করলেন ঠাকুরের যুবক শিষ্যদের উদ্দেশ্যে। এগারোখানি তখনই ঠাকুর দিয়েছিলেন—নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, তারক, শরৎ, শশী, বুড়ো গোপাল, কালী এবং লাটু—এই এগারো জনকে; আর একখানি ভক্ত গিরিশচন্দ্র পরে ঠাকুরকে দর্শন করতে এলে তাঁকে দেওয়া হল।

লীলাবসানের দিন ঘনিয়ে আসছে, ঠাকুর তখনও গড়ে তুলছেন ভবিষ্যতের সাধকদের। কথায় বলে 'ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তিন থাকতে নয়।' ঈশ্বরলাভের জন্য যারা বেরিয়েছে তাদের এসব দুর্বলতা থাকলে চলবে না। ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই বড়ো বংশের ভদ্রঘরের ছেলে; ঠাকুর তাঁদের পথে বার করে ছাড়লেন একেবারে, ভিক্ষা করতে পাঠালেন দ্বারে দ্বারে। বলে দিলেন, "ভিক্ষার অন্ন শুদ্ধ। কেউ গাল দেবে, কেউ আশীর্বাদ করবে,

আবার কেউ হয়তো পয়সাও দেবে, তোরা সব নিবি।" রাখাল প্রভৃতি সকলেই ভদ্রত্বের অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়ে ভিক্ষা করে নিয়ে এলে তাঁদের দিয়ে রাঁধিয়ে ঠাকুর স্বয়ং সেই অন্ন আস্বাদ করলেন।

কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবী রামকৃষ্ণ সংঘ-গঠন সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ হত গোপনে। সেই সময়েই একদিন ঠাকুর রাখালের রাজবুদ্ধির উল্লেখ করেন এবং স্বামীজী তদনুসারে 'রাজা' নাম দেন তাঁর। শুনে ঠাকুরের ভারি আনন্দ; বললেন, "রাখালের ঠিক নাম হয়েছে।"

রোগ-উপশম হবার নয় সবাই বুঝছেন, তবু আশা ছাড়তে পারছেন না। একদিন নরেন্দ্র এবং রাখালের চোখে মুখে হাত বুলোতে বুলোতে ঠাকুর বললেন, "শরীরটা কিছুদিন থাকতো তো লোকের চৈতন্য হত। তা রাখবে না; পাছে লোক সব ধরে পড়ে, সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে। একে কলিতে ধ্যানজপ নেই।" শুনে রাখাল আকুল কণ্ঠে মিনতি জানালেন, "আপনি বলুন যাতে আপনার শরীর থাকে।" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।" নরেন্দ্র বললেন, "আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে।" শুনে ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আর বললে কই হয়? এখন দেখছি এক হয়ে গেছে। ননদিনীর ভয়ে কৃষ্ণকে শ্রীমতী বললেন, 'তুমি হৃদয়ের ভিতর থাকো'; আবার যখন ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণকে দর্শন করতে চাইলেন—এমনি ব্যাকুলতা যেন বেরালে আঁচড় পাঁচড় করে—তখন কিন্তু বেরোয় না।" ভক্তেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন, কি বলতে চান ঠাকুর? রাখাল মৃদুস্বরে বুঝিয়ে দেন, উনি গৌর অবতারের উপমা দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুর

আবার বলতে লাগলেন, "এখানে যারা এসেছে, এরা কেউ সংসারী নয়; কারু কারু একটু ইচ্ছা ছিল মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকে, সে ইচ্ছাটুকু হয়ে গেছে। যে নিত্যসিদ্ধ, সে মনে করলে সংসারেও থাকতে পারে। কেউ কেউ দুখানা তলোয়ার নিয়েও খেলাতে পারে। এমন খেলোয়াড় যে ঢিল পড়লে তলোয়ারে ঠেকে ঠিকরে যায়।" বলা বাহুল্য, ঠাকুর রাখালচন্দ্রের কথাই বলছিলেন। রাজা মহারাজের জীবনে ঠাকুরের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসমাপনের দিন এল। ১২৯৩ সালের শ্রাবণের গভীর রাত্রে শিষ্যগণের জীবনের কর্ণধার, জীবনের জীবন, প্রেমময় ঠাকুর মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন। পরদিন সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরে তাঁর অপাপবিদ্ধ দিব্যদেহ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে শিষ্যগণ ও ভক্তগণ শূন্যমনে বুকভরা হাহাকার নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। রাজা মহারাজের মনে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি ছাড়া আর কোনো কিছুর স্থান নেই; পিতার ঐশ্বর্য, পত্নীর প্রেম, পুত্রের মমতা, কোনো কিছু তাঁকে টানতে পারল না আর। আনন্দমোহন বারবার এলেন, নানা ছলে নানা উপদেশ দিয়ে তাঁকে বাড়ী নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। রাজা মহারাজ ঠাকুরের উপদেশ মতো বাবার সঙ্গে সর্বদা সম্মানজনক ব্যবহার করতেন। কাশীপুর থেকে বলরামভবনে, সেখান থেকে বরানগর মঠে, রাজা মহারাজ যেখানেই থাকেন, আনন্দমোহন সেখানেই আসেন সংসারের আহ্বান নিয়ে। শেষে একদিন রাজা মহারাজ বিনয়নম্র অথচ স্পষ্ট বাক্যে তাঁকে বলে দিলেন, "কেন আপনারা কষ্ট করে আসেন? আমি বেশ আছি। আপনারা আমায় ভুলে যান আর আশীর্বাদ করুন যেন আমি



রাখালচন্দ্র

: ৬ই আগস্ট, ১৮৮৬

আপনাদের ভুলে যাই।" ঠাকুরের অদর্শনে জ্বলে যাচ্ছে তখন তাঁর অন্তর, তখন কি আর ক্ষুদ্র সুখ ভালো লাগে? ঠাকুর না বলে গেছেন, "ওরা তো সাধারণ মানুষের মতো সংসারসুখ ভোগ করতে আসে নি, ওরা এসেছে লোকশিক্ষা দিতে?" কেবলই মনে পড়ছে, যে মহাশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ নাম ও রূপ নিয়ে জগতে ধর্মসংস্থাপন করতে এসেছিলেন, যিনি জীবকল্যাণে আজীবন কঠোর সাধন করে গেছেন, তাঁরই অংশ তাঁরা, তাঁরই সন্তান, তাঁরই তপস্যার উত্তর সাধক। শান্ত, গম্ভীর চিত্তে রাজা মহারাজ ঠাকুরের অর্পিত দায়িত্বের কথা ভাবছেন। কাশীপুরের বাগানবাড়ী ছেড়ে দিতে হয়েছে; ভক্তেরা ছড়িয়ে পড়েছেন চারদিকে। ঠাকুরের তিরোধানের পনরো দিন পরেই শ্রীশ্রীমা গেলেন বৃন্দাবনে যোগীন, কালী আর লাটুকে সঙ্গে নিয়ে। পরে তারকও সেখানে গিয়ে যোগ দিলেন। নরেন্দ্র, শরৎ, শশী প্রভৃতি বাড়ী ফিরেছেন, কিন্তু শান্তি পাচ্ছেন না মনে। রাখাল বলরামের গৃহেই উঠেছিলেন প্রথমে, সেখান থেকে বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমার কাছে গিয়ে কাটিয়ে এলেন কিছুদিন। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্তানদের সংঘবদ্ধ করবার জন্য দিনরাত চিন্তা করছেন; তাঁর প্রচারিত সত্য, তাঁর আদর্শজীবনের পুণ্যকাহিনী নিজেদের জীবন দিয়ে জগতের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেবার ব্রতে উদ্বুদ্ধ সন্ন্যাসিদল গঠন করাই এখন তাঁর জীবনের প্রধান কাজ, অথচ পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। এই সময়ে রাজা মহারাজ বৃন্দাবন থেকে বলরাম-মন্দিরে ফিরে এলেন।

নয়

ঠাকুরের কাজের উপায় ঠাকুর নিজেই করলেন। একদিন পরমভক্ত শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র উন্মত্তের মতো ছুটে এলেন নরেন্দ্রের কাছে। ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে বলেছেন, "তুই করছিস কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার আগে একটা ব্যবস্থা কর।" তাঁর আগ্রহে এবং অর্থানুকূল্যে বরানগরে মুন্সী-বাবুদের জীর্ণ বাগানবাড়ী মাসিক এগার টাকায় ভাড়া নেওয়া হল। শুভদিনে উদ্যোক্তা নরেন্দ্রনাথ ও রাজা মহারাজ বলরাম-মন্দির থেকে ঠাকুরের শয্যা ও অন্যান্য ব্যবহৃত দ্রব্য নিয়ে একখানি গাড়ী করে বরানগরের নূতন মঠে এলেন। তারককে তার করে আনা হল। ক্রমে শশী, শরৎ, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, কালী, বাবুরাম প্রভৃতি সমবেত হলেন। কয়েক মাসের মধ্যে সারদাপ্রসন্ন, সুবোধ, গঙ্গাধর, হরি, তুলসী প্রভৃতিও গৃহত্যাগ করে এলেন। ত্যাগ, বৈরাগ্য ও তপস্যায় এঁরা প্রত্যেকেই যেন জ্বলন্ত বহ্নি, এঁদের পুণ্যস্পর্শে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম মঠবাড়ী ধন্য হল, পবিত্র হল। ঠাকুরের উপদেশ স্মরণ করে নরেন্দ্র রাখালকেই করলেন এই সন্ন্যাসি-সংঘের নেতা বা মঠাধ্যক্ষ। ঠাকুরের মর্তলীলাবসানের দু'মাসের মধ্যেই আশ্বিনের শেষদিকে নূতন পথে তাঁর বিদেহ-লীলার সূত্রপাত হল এমনি করে।

নরেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বরানগর মঠে যে নবীন তাপসবৃন্দ সমবেত হলেন, তাঁদের কাছে সত্যলাভের পথে কোন কৃচ্ছ্রসাধনই অত্যধিক বা অসাধ্য নয়। তপস্যার হাওয়া বইছে তখন মঠে, পাল তুলে দিলেই হল। দিনরাত অবিরাম জপ, ধ্যান, কীর্তন, শাস্ত্র-পাঠ, শাস্ত্রালোচনা চলেছে। নরেন্দ্রের ও রাখালের বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনের ছোঁয়াচ লেগে মঠবাসী সকলেরই মন উজ্জ্বল গৈরিকরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। নরেন্দ্রের উদ্যোগে এই মঠের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, রাখালের স্নেহে ও সেবায় এর দেহগঠন। এঁরা দুজনে যেন মঠের বাপ আর মা। শাস্ত্রব্যাখ্যা করতে বসলে নরেন্দ্রনাথের ভাষায় আগুন ছুটত, তাঁর প্রাণস্পর্শী উদ্দীপনাময় বাক্যে সংসারী সংসার ভুলে যেত, আহার নিদ্রা ভুলে যেত মানুষ। কোন গুরুভাই মঠ ছেড়ে যেতে চাওয়াতে রাখাল তাঁকে বলেছিলেন, "কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাস? এখানে এমন সাধুসঙ্গ, এ ছেড়ে যেতে আছে? আর নরেনের মতো লোকের সঙ্গ! এ ছেড়ে কোথায় যাবি?" মঠে কোন বিশৃঙ্খলা দেখলে, সাধুদের কারো কোন দোষত্রুটি দেখলে নরেন্দ্র রাখালকেই বকতেন। কিন্তু তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসার, তাঁর নাড়ীর টানের খবর রাখাল জানতেন, তাই হাসিমুখে গুরুভাই-এর সমস্ত গালাগাল, বকুনি সহ্য করতেন। পরক্ষণেই নরেন্দ্রকে শাস্ত্রালোচনা করতে শুনলে বাইরের ভক্তদের ডেকে বলতেন, "চল, নরেন কি বলছে শুনি গিয়ে।"

মঠপ্রতিষ্ঠার মাস দুই পরে পৌষমাসে নরেন্দ্রনাথ ন'জন গুরু-ভাইকে নিয়ে আঁটপুরে বাবুরামের পৈতৃক বাড়ীতে যান। সেখানে বাসকালে এক গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে ভক্তেরা নানা শাস্ত্রের এবং

মহাপুরুষদের জীবনকথার আলোচনা করতেন। ঐখানে নরেন্দ্রনাথ 'ইমিটেশন অফ ক্রাইষ্ট' বা 'ঈশানুসরণ' বইখানি পড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। খ্রীষ্টের সর্বত্যাগী শিষ্য-ভক্তদের কঠোর তপস্যা ও দুঃখ-বরণের কাহিনী এবং মানবকল্যাণে আত্মবলিদানের কথা বলতে বলতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ের অপূর্ব আদর্শের কথা বললেন, "ঠাকুরের আদর্শে ও ভাবে আমাদের জীবনগঠন করতে হবে। তাঁর ভাব, তাঁর মহান্ আদর্শ, তাঁর প্রেমপূর্ণ শান্তির বাণী জগতের মঙ্গলের জন্য, মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য আমাদের প্রচার করতে হবে। এই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত।" সেদিন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর—'ক্রিসমাস ঈভ' বা ঈশার আবির্ভাবের প্রাক্‌সন্ধ্যা। নবীন সন্ন্যাসীর দল সেদিন মর্মে মর্মে অনুভব করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রেরণায় নরেন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে যে সংকল্পবাক্য উচ্চারিত হয়েছে, তাকে অস্বীকার করার সাধ্য কারও নেই; তাঁর দিব্যশক্তি প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত করেছে নূতন জীবনে, অনুরঞ্জিত করেছে নূতন আনন্দরাগে। প্রথম বার রাখাল সঙ্গে ছিলেন না, তাই বাবুরামের ভক্তিমতী মায়ের অনুরোধে নরেন্দ্রনাথ রাখালকে নিয়ে আর একবার আঁটপুরে যান। বালকোচিত সরল-মধুর স্বভাবে সেখানে সকলকেই তিনি মুগ্ধ করেছিলেন। হিন্দুধর্মে বীতশ্রদ্ধ একজন যুবক খ্রীষ্টান হবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, রাখালের ধ্যানতন্ময় ভাব দেখে এবং উপদেশবাক্য শুনে তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন।

এতদিন তপস্যা চলেছে, কিন্তু তপস্বীদের বাহ্যিক স্বীকৃতি ছিল না। বিধিমতে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করে সন্ন্যাস নেন নি কেউ। আঁটপুর

থেকে ফেরার পর সকলেই ত্যাগের পথে অমৃতত্বলাভের সাধনার জন্ম চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, দেখা গেল। নরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ঠাকুরের সর্বত্যাগী শিষ্যবৃন্দ তাঁর পাদুকার সামনে এইবার বিধিমতে বিরজা-হোম করে সন্ন্যাস নিলেন। এখন থেকে নূতন নামে পরিচিত হলেন প্রত্যেকে। নরেন্দ্রনাথ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, রাখালচন্দ্র হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, তারকনাথ—স্বামী শিবানন্দ, যোগীন্দ্র—যোগানন্দ, বাবুরাম—প্রেমানন্দ, শরৎচন্দ্র—সারদানন্দ, নিরঞ্জন—নিরঞ্জনানন্দ। শশী, হরিনাথ, সারদা, কালী, লাটু, বুড়ো গোপাল, সুবোধ ও গঙ্গাধর যথাক্রমে রামকৃষ্ণানন্দ, তুরীয়ানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, অভেদানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, সুবোধানন্দ ও অখণ্ডানন্দ নামে পরিচিত হলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সকলেই 'রাজা মহারাজ' এবং স্বামী বিবেকানন্দকে 'স্বামীজী' বলে ডাকত মঠে। আমরাও অতঃপর এই দুটি নাম ব্যবহার করব।

বরানগর মঠের বাড়ীভাড়া ও সন্ন্যাসীদের খোরাক বাবদ ভক্ত সুরেন্দ্রনাথের যে মাসিক সাহায্য ছিল, সন্ন্যাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাতে টান পড়ল। আর কয়েকজন গৃহী ভক্তও মাঝে মাঝে টাকা পয়সা দিতেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে সঞ্চয় করা উচিত নয় বলে যেদিন যা আসতো, পরের দিনের জন্ম চিন্তা না করে খরচ করে ফেলা হত। খাওয়াপরার দিকে কারো নজর ছিল না। প্রত্যেকের চেষ্টা ছিল কি করে নিজের প্রয়োজন—এমন কি, প্রয়োজনবোধ—কমানো যায়। ভিক্ষায় বেরিয়ে যেদিন যা জুটত, ঠাকুরকে নিবেদন করে তাই খেতেন সকলে। ভিক্ষা আবার জুটত না প্রায়ই, জুটত তার পরিবর্তে লাঞ্ছনা। ভদ্রঘরের

জোয়ান ছেলেরা ভিক্ষা করে খাবে উপার্জন না করে—এটা অনেক ভদ্রলোকেই পছন্দ করতেন না। ফলে অনাহার ও অপমান ছিল তাঁদের নিত্য সঙ্গী। একদিন চার জন ভিক্ষায় বেরিয়েছিলেন, একমুঠো চাল বা একটা পয়সাও জুটল না। দুপুরবেলা কাঠফাটা রোদে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে তাঁরা এসে হাসিমুখে জানালেন, "আজ ভিক্ষা মিলল না।" তখন সকলে যুক্তি করে স্থির করলেন ভগবানের নামকীর্তন করে তাঁরা ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে থাকবেন। স্বামীজীর সঙ্গে কীর্তনানন্দে মেতে গেলেন সকলে।

এদিকে ঠাকুরের ভোগ হয় না দেখে শশী মহারাজ মঠের কাছাকাছি এক বন্ধুর বাড়ী থেকে অভিভাবকদের লুকিয়ে একপোয়া আন্দাজ আলোচাল, ক'টা আলু এবং একটু ঘি ভিক্ষা করে নিয়ে এলেন। তাই রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে তিনি প্রসাদটুকু ছোটো ছোটো ডেলা পাকিয়ে নিয়ে গেলেন কীর্তনের জায়গায়, ফেলে দিতে লাগলেন প্রত্যেক গুরুভ্রাতার মুখে তারই এক একটি। সকলের কি আনন্দ, কি তৃপ্তি সেই একগ্রাস প্রসাদ পেয়ে! কত দিনই এমন অর্ধাহারে বা একেবারে অনাহারে কেটেছে! ভাত জোটে তো নুন জোটে না। তরকারি নেই, বেড়ার গায়ের তেলাকুচার পাতা রান্না হয়েছে। রাত্রে নুন দিয়ে দু'খানা বা এক খানা করে রুটি খেয়ে কেটেছে সকলের। শীতনিবারণের বস্ত্র নেই, শয্যা নেই, পাদুকা নেই, পরনের কাপড়ের পর্যন্ত টানাটানি। অধিকাংশ সময় কৌপীন সম্বল; বাইরের লোক দেখা করতে এলে বা কোথাও যেতে হলে কাপড় যা দু'একখানি ছিল তাই ব্যবহার হত। এত অভাব, কিন্তু আনন্দের কমতি নেই, তপস্যার বিরাম

নেই। স্বামীজী ঠাকুরের এক একটি উপদেশ নিয়ে এক একদিন মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচীন প্রাচ্য দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তার বিশ্লেষণ করে দেখান; সাধকদের অন্তরে বৈরাগ্যের আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ে তাঁর কথায়।

কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যের উচ্চ স্তরে ওঠবার সময় লোকসঙ্গ, এমন কি, অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসীদের সঙ্গও ভালো লাগে না। ক্রমে সাধকদের সেই অবস্থা এল। অনেকেই একে একে তীর্থদর্শনে এবং নিজ সাধনার চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লেন। রাজা মহারাজের জীবনেও অতৃপ্তি এল, নির্জন সাধনার জন্য ব্যাকুলতা এল। তিনি স্বামীজীকে সে কথা বললেন, "এখানে থেকে তো কিছু হল না। ঠাকুর বলেছিলেন ভগবানদর্শন; তা হল কই? ইচ্ছা হয় নর্মদায় বেরিয়ে পড়ি।" স্বামীজী বললেন, "বেরিয়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয়, তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস?" রাজা মহারাজ কিন্তু মনকে প্রবোধ দিতে পারছেন না; কখনও মনে হয় পঞ্চতপা করেন, কখনও মনে হয় তীর্থে গিয়ে সাধনভজন করেন। গৃহী ভক্ত মাষ্টার মশাইকে বলছেন, "মাষ্টার মশাই, আসুন সকলে মিলে সাধন করি। নরেন্দ্র কাল রাত্রে বেশ বললে, 'যতক্ষণ আমার কাম, ততক্ষণই স্ত্রীলোক; তা না হলে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদবোধ থাকে না। মায়াতীত না হলে কেমন করে জ্ঞান হবে? ক্ষুধাতৃষ্ণা, সুখদুঃখ, এসবও মায়া। মনের নাশের পর যা থাকে তাই ব্রহ্ম।' সাধন চাই, সাধন ছাড়া ঐ চরম সত্যপ্রকাশের কোনই সম্ভাবনা নেই।"

স্বামীজীর অনুরোধে মঠরক্ষার কাজ নিতে রাজা মহারাজ আপত্তি

করেন নি, কিন্তু সত্যসুন্দরলাভের ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁর নগরের কোলাহল থেকে সাময়িকভাবে বাইরে না গেলেই নয়। সাধনার অনুকূল আবহাওয়ার জন্যই তীর্থযাত্রার প্রয়োজন। শ্রীশ্রীমা নীলাচল যাচ্ছিলেন, রাজা মহারাজ তাঁর সঙ্গী হলেন। ১২৯৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁর দেশভ্রমণ আরম্ভ হল।

দশ

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাজা মহারাজ পুরী গেলেন। সেখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শন এবং প্রেমবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের স্মরণে ও ভিক্ষান্ন-ভোজনে আনন্দেই কাটল। কিন্তু তাঁর সাধনার কঠোরতায় শ্রীশ্রীমা দুঃখ পান দেখে বলরাম বাবু তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসে যত্ন করতে লাগলেন। সাধনার পথে অন্তরায় উপস্থিত হল আবার। অগত্যা সেযাত্রা কটক হয়ে বরানগর মঠে ফিরে এলেন রাজা মহারাজ। কিন্তু সেখানেও তৃপ্তি পেলেন না। ঠাকুরের কাছে থাকতে যে পরমা শান্তি ও নিবৃত্তি তাঁর মন সারাক্ষণ অনুভব করত, যে অপার্থিব আনন্দে তিনি পৃথিবী ভুলে থাকতেন, তা কোথায়? তা কি আর ফিরে আসবে না? কি করলে, কোথায় গেলে, সেই পূর্বলব্ধ অনুভূতি আবার আস্বাদ করা যায়? মঠ-পরিচালনায় আর মন বসে না। স্বামীজী লক্ষ্য করলেন তাঁর অবস্থা। নিজেও তিনি ঐ জ্বালায় জ্বলছেন। তাঁরই পরামর্শে রাজা মহারাজ শ্রীশ্রীমার অনুমতিক্রমে স্বামী সুবোধানন্দকে সঙ্গে করে বৈদ্যনাথ হয়ে কাশী এলেন। স্বামীজী ঠাকুরের ভক্ত শ্রীপ্রমদাদাস মিত্রকে চিঠি দিয়েছিলেন। পিশাচ-মোচন পল্লীতে তাঁর বাগান সাধনার অনুকূল এবং বেশ নির্জন দেখে দু'জনে সেখানেই আশ্রয় নিলেন। প্রমদা বাবুর বড়ৌতে খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছিল, কিন্তু রাজা মহারাজ রাজী হলেন না; সত্রে

ভিক্ষা করে তাঁরা কোনমতে উদরপূর্তি করতেন। নিত্য গঙ্গাস্নান, ৺বিশ্বনাথ ও ৺অন্নপূর্ণা-দর্শন, সত্রে ভিক্ষা এবং নীরবে সাধনভজন —এই ছিল তাঁদের কাজ। সুপণ্ডিত, পরম ভক্ত প্রমদাবাবুও নিয়মিত এসে কিছুক্ষণ সদালাপ করে যেতেন। অন্তরের দাহ কমল কতকটা এখানে এসে। রাজা মহারাজের মনে পড়ল, এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব মণিকর্ণিকা ঘাটে স্বয়ং বিশ্বনাথকে পরলোক-যাত্রী মানবের কানে তারকব্রহ্মমন্ত্র শুনিয়ে বেড়াতে দেখেছিলেন, আর জগন্মাতাকে মহাকালীরূপে চিতার উপর বসে তাদের সকল-রকম সংসার বন্ধন খুলে নির্বাণের পথে অখণ্ডের ঘরে পাঠিয়ে দিতে দেখেছিলেন। রাজা মহারাজ মানসচক্ষে অবিমুক্তক্ষেত্র বারাণসী-ধামের স্বরূপ উপলব্ধি করতেন। কত ঋষি-তপস্বীর, কত পুণ্যাত্মা সাধকের সাধনক্ষেত্র ও সিদ্ধপীঠ এই কাশী! উত্তরবাহিনী গঙ্গার তীরে শত শত মন্দিরচূড়াশোভিত এই পুণ্যপুরী! অহরহ 'হর হর', 'শিব শিব' ধ্বনিতে কেঁপে উঠছে এর আকাশ বাতাস। এ জায়গা কারও ভালো না লেগে উপায় আছে? রাজা মহারাজের মনঃপ্রাণ ক্ষণে ক্ষণে ভাবোচ্ছ্বাসে স্পন্দিত হয়ে উঠত, আবার পরক্ষণেই নিস্পন্দ হয়ে যেত। 'শিব শিব' ধ্বনি শুনতে শুনতে পরমানন্দে ব্রহ্মধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন তিনি।

সে-সময়ে সারদানন্দ ছিলেন হৃষীকেশে, তিনি সেখানে যাবার জন্য লিখলেন রাজা মহারাজকে; কিন্তু তিনি কাশী ছেড়ে যেতে চাইলেন না। মাঘ মাস পর্যন্ত কাটল কাশীতে, কিন্তু প্রাণের পিপাসার পরিপূর্ণ তৃপ্তি এখানেও হল না। এই সময় এক পরিব্রাজক সাধুর সঙ্গে পরিচয় হল তাঁদের; নর্মদাতীরে সাধন-ভজনের তাঁর

খুব আগ্রহ। রাজা মহারাজের মনকে তো দীর্ঘকাল থেকেই নর্মদা টানছেন; মনের মতো সঙ্গী পেয়ে অতঃপর তিনি ও সুবোধানন্দ পরিব্রাজকের সঙ্গে ওঙ্কারনাথে উপস্থিত হলেন।

পুণ্যতোয়া, স্বচ্ছসলিলা নর্মদার তীরে তীরে ছোটো ছোটো পাহাড়ে টিলায় অপূর্ব শ্যামল শোভার সমারোহ, অখণ্ড নির্জনতার মধ্যে কলকলধ্বনি উঠছে দিবারাত্র। কত অশান্ত পরমার্থ-পিপাসু মন শান্ত সমাহিত হয়েছে এই তপস্যার পরিবেশে। দূর অতীতে কত যোগিজন তাঁদের ধ্যানের দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন এখানে। আচার্য শঙ্করের কীর্তিকাহিনী-বিজড়িত এই তীর্থ রাজা মহারাজের বহুদিনের ঈপ্সিত তপস্যাক্ষেত্র। একটি দশনামী সম্প্রদায়ের মঠে তিন জনের স্থান হল। তার সামনে নদীর অপর তীরে ওঙ্কারনাথের অভ্রভেদী মন্দির। অনুকূল স্থানে আসন পেতে কঠোর সাধনায় রত হলেন তাঁরা। স্বভাবসুন্দর আধ্যাত্মিক আবেষ্টনের মধ্যে চলল তীব্র তপস্যা। অতীতের সাধকেরা যে অপার্থিব প্রেমের প্রভাবে পাষাণ গলিয়ে দিতেন, সেই প্রেমের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে এখানে রাজা মহারাজ চিত্তের দৃঢ়তা ফিরে পেলেন। একাদিক্রমে ছ'দিন ছ'রাত একাসনে ধ্যানসমাহিত হয়ে অতীন্দ্রিয় আনন্দসাগরে ডুবে রইলেন তিনি। সমাধিকালে গুরুভ্রাতা সুবোধানন্দ এবং সেই পরিব্রাজক সাধুটী তাঁর দেহ সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে রাজা মহারাজ বলতেন, "নির্বিকল্প সমাধির পর ধর্মজীবন আরম্ভ হয়। তখনই যথার্থ চিত্তবিক্ষেপ বা 'স্ট্রাগ্‌ল্' (অন্তর্দ্বন্দ্ব) আরম্ভ হয়, তুচ্ছ কাম ক্রোধ নিয়ে 'স্টাগ্‌ল্' তো তার তুলনায় কিছুই নয়।" নির্বিকল্প সমাধির পর যে ধর্মজীবনের আরম্ভ, তার ধারণা করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব।

ওঙ্কারনাথ থেকে রাজা মহারাজ সঙ্গীদের নিয়ে পঞ্চবটী দেখতে গেলেন। যে পঞ্চবটীবনের গাছের পাতায় পাতায় রাম-জানকীর বনবাসের বড়ো সুখের, বড়ো দুঃখের দিনগুলির কথা লেখা, যার স্মরণে আজও ভারতের প্রত্যেক কুটিরবাসীর চোখে সমবেদনার অশ্রু দেখা দেয়, সে পঞ্চবটী আজ আর নেই। শ্বাপদবিক্ষুব্ধ দণ্ডকারণ্য আজ কোলাহলমুখর নগররাজিতে আত্মগোপন করেছে। তবু সেই গোদাবরী, সেই পর্বতমালা, সবার উপরে অতীতের সেই পুণ্যস্মৃতি! নানা পরিবর্তন ও বিক্ষেপের মধ্যেও জায়গাটি রাজা মহারাজের ভাল লাগল। তিনি ভাবাবিষ্ট চিত্তে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলেন; দিব্যদৃষ্টি লাভ করে তাঁদের মর্ত্যলীলা দেখে দেখে তাঁর যেন আশা মিটত না। একাদিক্রমে প্রায় তিন দিন তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছিলেন এই সময়। লীলা তো যুগযুগান্তর ধরেই চলেছে; "কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।" রাজা মহারাজের মতো ভাগ্যবান এ জগতে ক'জন?

সীতারামের পুণ্য লীলাক্ষেত্রে কয়েকদিন কাটিয়ে তাঁর ইচ্ছা হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপূত, আচার্য শঙ্করের ধর্মসাম্রাজ্যের পশ্চিম রাজধানী, শ্রীমন্দির ও সারদামঠ-শোভিত দ্বারকা-দর্শনের। যে মন্দিরে মীরাবাই তাঁর প্রিয়তম রণছোড়জীকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর শ্রীঅঙ্গে লীন হয়েছেন, রাজা মহারাজ সেই মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বোম্বাইএ এলেন। ঠাকুরের গৃহী ভক্ত শ্রীকালীপদ ঘোষের একান্ত অনুরোধেও তিনি তাঁর বাড়ীতে উঠলেন না; ৺মুম্বা দেবীর মন্দিরের পাশে নির্জনবাস করে আট দিন ভিক্ষান্নে কাটালেন। তাঁর তেজঃপুঞ্জ, লাবণ্যময়, ধ্যানগম্ভীর মূর্তিদর্শনে মুগ্ধ হয়ে এক ভাটিয়া

মহাজন তাঁদের তীর্থভ্রমণের যাবতীয় ব্যয় দিতে চেয়েছিলেন; রাজা মহারাজ নেন নি। তখন শেঠজী তিন জনের দ্বারকা যাবার জন্য স্টীমারের টিকিট কিনে সুবোধানন্দের হাতে দেন। এই তীর্থভ্রমণের সময় রাজা মহারাজ না চাইতেই তাঁর পাথেয় কোথাও না কোথাও থেকে এসে গেছে বরাবর। সন্ন্যাসাশ্রমের আদর্শ তিনি বরাবর রক্ষা করে চলেছেন, কোনদিন এক কপর্দক স্পর্শ করেন নি। দৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ বা অন্ন কিছুই তিনি রাখতেন না পরিব্রাজক অবস্থায়। বেট দ্বারকায় এক ধর্মশালার অধ্যক্ষ সুবোধানন্দকে কয়েক সের বাদাম দেন ভিক্ষাস্বরূপ। রাজা মহারাজ তাঁদের প্রয়োজন মত দু'ছটাক রেখে বাকি বাদাম ফিরিয়ে দিতে বলেন। ঠাকুরের উপদেশ ছিল, "সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করতে নেই।" রাজা মহারাজ পরিব্রাজক-জীবনে সেই নির্দেশ মেনে চলেছেন।

দ্বারকায় গোমতীস্নানের জন্য দু'টাকা রাজকর দিতে হয়। নিঃসম্বল সন্ন্যাসীরা অস্নাত অবস্থায় ফিরে যান দেখে এক ধনী শেঠ তাঁদের হয়ে টাকা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা নেন নি। গোমতীস্নানের চেয়ে তীর্থরাজ সমুদ্রে স্নান অধিক পুণ্যজনক, বৃথা অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নেই, এই বলে তাঁরা চলে আসেন। শেঠজী দ্বারকায় বাসকালে তিন দিন তাঁদের সেবা করেছিলেন, পাথেয় এবং বিভিন্ন স্থানে তাঁর কর্মচারীদের কাছে পরিচয়পত্র দিতেও চেয়েছিলেন, কিন্তু রাজা মহারাজ নেন নি। সর্বত্রই তাঁর এক কথা, "আমার কোন বস্তুর অভাব বা আবশ্যক নেই; সাধু সন্ন্যাসীর ঈশ্বরই একমাত্র আশ্রয় ও ভরসা।"

দ্বারকায় তিন দিন মহানন্দে কাটিয়ে তাঁরা বেট দ্বারকায় যান। সাত ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটেই গেলেন শেঠজীর প্রদত্ত পাথেয় প্রত্যাখান ক'রে। বেট দ্বারকা থেকে ফিরে সুদামাপুরী বা পোর-বন্দর দর্শনে গেলেন রাজা মহারাজ। রাজাধিরাজ শ্রীকৃষ্ণের দরিদ্র বাল্যসখা সুদামার স্মৃতিপূত এই পুরী; এইখানে ভগবান ভক্তকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেছিলেন, প্রেমে ও মাধুর্যে অভিষিক্ত করে তাঁকে ভক্তিজগতে গৌরবমুকুট পরিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারী হৃদয়ের রাজাসনে বসিয়ে যাঁকে যুগযুগান্তর ধরে পূজা দিচ্ছে, তাঁর দিব্যভাবে ভাবিত হয়ে রাজা মহারাজ কয়েক দিন সুদামাপুরীতে কাটালেন, তারপর সঙ্গীদের নিয়ে জুনাগড় হয়ে গির্ণার পর্বতে গেলেন। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান সকলেই ছাপ রেখে গেছেন এখানে। ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীতের সাক্ষী বহুপুরাকীর্তিশোভিত এই পর্বতশিখরে শিবরাত্রিব্রত পালন করে রাজা মহারাজ খুব আনন্দ পেলেন।

গির্ণার থেকে নেমে পদব্রজে গুজরাতের মধ্য দিয়ে তীর্থযাত্রীরা আবার চলেছেন। প্রথমে আমেদাবাদ; সেখানে দু'দিন বিশ্রাম করে রাজপুতানার শৈলপ্রান্তর পার হয়ে পুষ্কর। অতি প্রাচীন এবং মনোরম স্থান এই পুষ্কর। বালুকাময় সমতলভূমির মধ্যে বিরাট হ্রদ, দু'দিকে তার শ্যামলবনরাজিভূষিত পর্বতমালা। হ্রদের কাঁচের মতো স্বচ্ছ জলে ছায়া ফেলে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে সাবিত্রী পাহাড়,—শিখরে তার ব্রহ্মা এবং সাবিত্রীদেবীর মন্দির। হ্রদের ধারে ধারে কত ঘাট, কত মন্দির! জলে দলে দলে কুমীর ভাসছে, মাছ এবং জলচর পাখী খেলা করে বেড়াচ্ছে। রাজা

মহারাজ পুষ্করে একাদিক্রমে আট-ন' দিন ভূমানন্দে কাটালেন। সেখানে এক বাঙ্গালী ব্রহ্মচারীর আশ্রয়ে খুবই যত্নে ছিলেন। সঙ্গী পরিব্রাজকটি এই সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। আজমীর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল তাঁকে অতিকষ্টে। সেখানে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করে রাজা মহারাজ ও সুবোধানন্দ অতঃপর তাঁর কাছে বিদায় নিলেন বৃন্দাবনযাত্রার উদ্দেশ্যে। নির্মম সন্ন্যাসী তাঁরা। সংসারের বন্ধন আগেই খসে গেছে, পথের সঙ্গীর বন্ধন পথেই খসে গেল। জুতো নেই, ছাতা নেই, কম্বল নেই, কাল কি খাবেন তার স্থিরতা নেই। ভিক্ষা নিলে রান্না করা জিনিসই নিতেন, কারণ রাঁধবার সরঞ্জাম সঙ্গে থাকত না। বাস কোন দিন গাছতলায়, কোনদিন ধর্মশালায়, কোনদিন শ্মশানে বা নদীতটে। পথে অযাচিত সাহায্য বারবার এসেছে, ধনীর নিমন্ত্রণ বারবার প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। ট্রেনের টিকিট জোর করে কেউ কিনে দিলে ট্রেনে উঠছেন, না হলে পায়ে হেঁটেই চলেছেন দীর্ঘপথ দিনের পর দিন। এমন নইলে তীর্থভ্রমণ!

এগারো

বৃন্দাবনে এবার দ্বিতীয়বার আগমন হল। কোথা থেকে যেন শ্যামসুন্দরের বংশীধ্বনি শুনতে পান তিনি; কুঞ্জে কুঞ্জে খুঁজে খুঁজে ফেরেন তাঁকে, কিন্তু দর্শন তো মেলে না, প্রবল বিরহানলে বুক ফেটে যাচ্ছে, জীবন দুর্বহ বোধ হচ্ছে, পূর্বাস্বাদিত অলৌকিক রসানুভূতির জন্য অন্তরে হাহাকার উঠেছে। নির্বিকল্প সমাধিলাভ হয়েছে যাঁর একদিন, আজ তিনি সাকাররূপে, রসময়রূপে শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য উন্মত্ত! এ রহস্য সাধক ছাড়া কে বুঝবে? ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ ঠাকুরের ভক্ত বলরাম বাবুকে তিনি যে চিঠিখানি লিখেছেন, তার ছত্রে ছত্রে এই প্রবল অশান্তি এবং অন্তর্বেদনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল—"তাঁর লীলা কেহ বুঝিতে পারে'না। এ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ এবং শান্তিতে অবস্থান করে, এমন লোক অতি বিরল। বিশেষ ভাগ্যবান তিনিই যিনি সকল বাসনা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, বোধ করি শান্তিরাজ্যে তাঁরই অধিকার। এ জগতে সুখের ভাগ অতি অল্প, দুঃখের ভাগই অধিক। যাহার অহংকার একেবারে পরিত্যাগ হইয়াছে, মন বুদ্ধি প্রাণ যিনি সেই জগদীশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন, আমার বলিতে কিছুই নাই, এমন ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান এবং যথার্থ সুখী। জীবের নিজের কোন বিষয় করিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র নাই,

সর্বদা তাঁহার নিকট প্রার্থনা ভিন্ন অন্ত উপায় নাই। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিতেন, 'স্ত্রী-পুত্রাদিতে যেরূপ লোকের আসক্তি এবং ভালবাসা, ভগবানের নিমিত্ত কটা লোকের সেরূপ ভালবাসা হয়?' বোধ করি শতাংশের একাংশ জীব ভগবানকে ভালবাসিতে পারে না, এবং কটা লোকই বা ভাল বাসিতে চেষ্টা করে? বাহ্যজগৎ হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে এবং বাহ্যজগতে থাকিতে বড়ো ভালবাসে। ইহাই মনের স্বধর্ম। এই মনকে সর্বপ্রকারে বাহ্যবস্তু হইতে উঠাইয়া লইয়া সেই হরিপাদপদ্মে স্থিতি করা, ইহা কেবল ভগবানের কৃপা না হইলে কোনমতে হওয়ার সম্ভাবনা নাই। উপস্থিত আমার মনের অবস্থা বড় ভালো নহে। যত দিন যাইতেছে ততই অজ্ঞান এবং অশান্তি মনকে জড়ীভূত করিতেছে। সাধন ভজন দ্বারা মনে শান্তি পাইব, এরূপ আশা নাই। যেমন পক্ষীর পক্ষ না থাকিলে উড়া অসম্ভব, তদ্রূপ অনুরাগবিহীন সাধনভজনের চেষ্টা আমার পক্ষে বিফল হইতেছে। এখন বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। আশীর্বাদ করুন যেন গুরুপাদপদ্মে মিশিয়া যাই, আর আমার কোন বাসনা না থাকে।"

ঈশ্বরকোটী, নির্বিকল্পসমাধিবান মহাপুরুষের জীবনেও কি অন্তর্দাহ লোকচক্ষুর আড়ালে ঘটে থাকে, এ চিঠিখানি তারই সাক্ষী। ব্রজধাম রাখালের স্বধাম, 'নিজবাসভূমে পরবাসী' হওয়ায় লীলাময় সখা শ্যামসুন্দরের প্রেমঘনরূপ দেখতে না পাওয়ায়, দুঃখে তিনি সেখানে পাগল-প্রায় হয়েছিলেন কিছুদিন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিচ্ছেদবেদনাও মনে হয়, সে সময় তাঁর অবচেতন মনে কাজ করেছিল। বৃন্দাবনে অধিকাংশ সময় রাজা মহারাজ অন্তর্মুখী

অবস্থায় কাটাতেন। দিবারাত্র নামজপে এবং ধ্যানে কেটে যেত, দিনের পর দিন সুবোধানন্দের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত হ'ত না। ভিক্ষায় নির্দিষ্ট স্থানে রেখে তিনি চলে যেতেন; রাজা মহারাজ কোনোদিন কিছু তা থেকে তুলে মুখে দিতেন, কোনদিন স্পর্শও করতেন না। এরকম লোকের সঙ্গে মানুষ থাকতে পারে? যেন অস্থির হয়ে উঠলেন সুবোধানন্দ। মাঝে মাঝে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে ভাগবতপাঠ শুনতে যান। গোস্বামী তখন শ্রীশ্রীগোপীনাথ মন্দিরের বাগানে থাকেন; ব্রজবাসী বৈষ্ণবদের সঙ্গে কীর্ত্তনাদি ক'রে ভক্তিমার্গের সাধনায় রত তখন তিনি। শ্রীবিগ্রহ দেখতে গিয়ে রাজা মহারাজ গোস্বামীজীর খবর পেলেন সুবোধানন্দের কাছে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের স্নেহবন্ধনে একদিন দুজনেই বাঁধা পড়েছিলেন, বহুদিনের পরিচয়! রাজা মহারাজ দেখা করতে গেলেন গোস্বামীজীর সঙ্গে। বড়ো আনন্দিত হলেন গোস্বামীজী। সুবোধানন্দের কাছে মহারাজের কঠোর তপস্যার কথা শুনেছিলেন তিনি; কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "পরমহংসদেব তো আপনাকে সবরকম সাধনভজন, অনুভূতি, দর্শনাদি করিয়ে দিয়েছেন, তবে আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধনা করছেন?" ব্রহ্মানন্দ মৃদুস্বরে বললেন, "তাঁর কৃপায় যেসব অনুভূতি বা দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি মাত্র।" বিজয়কৃষ্ণ বুঝলেন, রাজা মহারাজকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা বৃথা। তবু তাঁর কষ্ট লাঘবের জন্য তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন। বৃন্দাবনে সেবার খুব ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে। রাজা মহারাজও জ্বরে পড়লেন। খবর পেয়ে গোস্বামীজী দেখা করতে গেলেন তাঁর সঙ্গে। গিয়ে দেখেন

রোগীর মশারি নেই, বৃন্দাবনের ভীষণ মশার উপদ্রবের মধ্যে বসে তিনি সারারাত বিনা মশারিতে জপধ্যান করেন অরগায়ে। গোস্বামীজী নিজে মশারি এনে খাটিয়ে দিলেন ; ওষুধ এবং পথ্যের ব্যবস্থা করলেন। সেই ওষুধেই রোগমুক্ত হলেন মহারাজ। এদিকে খবর আসছে, তাঁদের গুরুভাইরা অনেকেই উত্তরাখণ্ডে তপস্যা করছেন ; সুবোধানন্দও হরিদ্বার যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। রাজা মহারাজকে সেকথা বলাতে তিনি বললেন, "আমি হেঁটে বোধ হয় অত পথ যেতে পারব না, তোর যদি যাবার ইচ্ছে হ'য়ে থাকে তবে তুই যা, আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না।" সুবোধানন্দ তাঁর কথামত ব্রজপরিক্রমা করতে বেরিয়ে আর ফিরলেন না ; সোজা হরিদ্বার যাত্রা করলেন।

রাজা মহারাজ এখন ব্রজধামে নিঃসঙ্গ। কে তাঁর দেখাশোনা করবে, তাকে ভিক্ষা করে এনে খাওয়াবে ? কিন্তু সেজন্য দৃক্‌পাত তাঁর নেই। ইচ্ছা হ'ল, কোনদিন মাধুকরী করলেন, কোনদিন কোন কুঞ্জে খেয়ে এলেন, কোনদিন বা আহার নিদ্রা ভুলে ঘরের মধ্যে ধ্যান জপে মগ্ন রইলেন। এমনি ভাবে চলল তাঁর তীব্র তপস্যা। যেদিন প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রয়োজন হ'ত, সেদিন কোন না কোন ভক্ত অযাচিতভাবে তাঁর জন্য আহার্য্য দিয়ে যেত।

বৃন্দাবনে থাকতে একদিন রাজা মহারাজ বলরাম বাবুকে জ্যোতির্ম্ময় দেহে দিব্যধামে যেতে দেখলেন। পরদিন তারযোগে খবর পেলেন যে পূর্বদিন সেই সময়ে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। দারুণ আঘাত পেলেন রাজা মহারাজ। বলরাম বাবু তাঁর আত্মীয়ের অধিক ছিলেন। এই বৃন্দাবনেই একদিন তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায়

কি আনন্দে দিন কেটেছে! কত স্মৃতি তাঁর ছড়িয়ে আছে বৃন্দাবনের পথে পথে। এ তো মায়ার বন্ধন নয়—আধ্যাত্মিকতার প্রেমসূত্রে, কল্যাণমৈত্রী। বলরাম বাবুর দেহত্যাগের বারো দিন পরেই রাজা মহারাজের গুরুভাই এবং পরম হিতৈষী বন্ধু সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ এল। আঘাতের পর আঘাতে ব্যথিত, বিচলিত হয়ে উঠলেন রাজা মহারাজ। হিমালয়ের বিজন পার্বত্য প্রদেশে কোথাও একা বসে সাধনা করবার জন্য তাঁর মন ক্রমে ব্যাকুল হয়ে উঠল। ১৮৯০ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রজধাম থেকে পদব্রজে যাত্রা করে মহারাজ কনখলে এলেন হরিদ্বার হ'য়ে। সেখানে একটি পর্ণকুটীরে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, একাসনে সমাহিত চিত্তে কাটাতে লাগলেন তিনি। (এই জায়গাতেই বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে)। চারিদিকে অরণ্য ও পর্বতের অপূর্ব পরিবেশ, মাঝে মাঝে সাধু-মহাত্মাদের কুটীর। বড়ো আনন্দে কাটতে লাগল দিন। কোনদিন ভিক্ষায় যান, কোনদিন যান না; নিশ্চেষ্টভাবে, অনাহারে দিবারাত্র আনন্দসাগরে ডুবে কাটিয়ে দেন।

স্বামীজী তখন ছিলেন গাজিপুরে পওহারী বাবার কাছে। সুরেশ বাবু এবং বলরাম বাবুর মৃত্যুসংবাদে বিচলিত হয়ে তিনি বরানগর মঠে ফিরে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমভক্ত ছিলেন এঁরা দু'জনে। এঁদের পরলোকগমনে শুধু ভ্রাতৃবিয়োগের বেদনা নয়, আর্থিক চিন্তাও অস্থির করেছিল তাঁকে, কারণ বরানগর মঠের রসদদার ছিলেন এঁরা দু'জন। ভক্তকবি গিরিশচন্দ্র মঠের সাহায্যের ভার নিলে মঠস্থ গুরুভাইদের উৎসাহিত করে স্বামীজী আবার তীর্থপর্যটনে বেরিয়ে

পড়েন স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে। নানাস্থান ঘুরে হৃষীকেশে যখন তিনি অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে কঠোর তপশ্চর্যায় নিরত, সেইসময় তাঁর কঠিন পীড়া হয়। একজন সাধুর চিকিৎসায় উপস্থিত বিপদ কাটল বটে, কিন্তু শরীর সারল না।

সুচিকিৎসার জন্য তাঁর দিল্লী যাওয়ার কথা হল। দিল্লীর পথে স্বামীজী রাজা মহারাজকে দেখতে কনখলে এলেন। সেখানে সকলের সমবেত সেবায় শরীরে একটু বল পেলেন স্বামীজী; কিন্তু রাজা মহারাজকে তিনি ছাড়তে চাইলেন না। মহারাজও তাঁর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না, তাঁদের সঙ্গী হলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ সে সময়ে স্বাস্থ্যলাভের জন্য মীরাটে ছিলেন। রাজা মহারাজের সঙ্গে অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই তাঁর। প্রধানতঃ তাঁরই আগ্রহে দিল্লীর পথে মিরাট যাওয়া হ'ল। সেখানে স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভালর দিকে যাচ্ছে দেখে তাঁরা মার্চ মাস পর্যন্ত মীরাটেই থেকে গেলেন। স্বামীজীর স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানভজন, পঠনপাঠন চলল কিছুদিন নিয়মিত। তারপর তিনি একাই দিল্লী গেলেন। গুরুভাইয়েরা দিল্লী গিয়ে পৌঁছালেন তার পরে। সেখানেও জমে উঠল আনন্দমেলা, সাধনার আবহাওয়া। কিন্তু হঠাৎ স্বামীজী একদিন বললেন, আমি ভেতর থেকে ইঙ্গিত পাচ্ছি, আমাকে একা থাকতে হবে। তোমরা যাও, যেমন ধ্যান-ভজন তপস্যা করছ, তেমনি কর। আমি এবার একলা বেরুব; কোথায় থাকব, কাউকে সন্ধান দেব না। প্রভুর ইচ্ছা হলে আবার সকলে মিলিত হব।" স্বামীজী একাই বেরিয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশ-যাত্রায়। রাজা মহারাজও আট দিন পরে তুরীয়ানন্দের সঙ্গে

তীর্থপর্যটনে বেরুলেন। জ্বালামুখীতে কিছুদিন বাস করে তাঁরা পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মধ্য দিয়ে সক্করের কাছে সাধবেলার মঠে যান। দ্বীপের মধ্যে মঠ। মনোরম দৃশ্য, সাধনার উপযোগী পরিবেশ এবং মঠাধ্যক্ষের একান্ত আগ্রহ দেখে সেখানে তাঁরা কিছুদিন সাধনভজন করেন। তারপর সেখান থেকে করাচি হয়ে জাহাজে বোম্বাই গেলেন। সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে তিনবৎসর পরে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়ে গেল ঠাকুরের পরম ভক্ত কালীপদ ঘোষের বাড়ীতে। শিকাগো ধর্মসভায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে অজ্ঞাতবাস ছেড়ে স্বামীজী বোম্বাই গেছেন তখন। গুরুভাইদের দেখে খুব আনন্দিত হলেন তিনি। তুরীয়ানন্দকে বললেন, "হরিভাই, এই ধর্মসভার অধিবেশন আমার জন্য হচ্ছে।" তারপর কথাপ্রসঙ্গে দু'জনকে বললেন, "ধর্মকর্ম আর কিছু বুঝতে পারি আর না পারি, দরিদ্র, দুর্বল, পতিত, অজ্ঞ নরনারীর অবস্থা চোখে দেখে হৃদয়টা খুব বেড়ে যাচ্ছে।" কিন্তু তখনই আমেরিকা যাওয়া হ'ল না তাঁর। খেতড়ীর রাজার নিমন্ত্রণে তাঁর নবজাত পুত্রকে আশীর্বাদ করতে তাঁকে খেতড়ী যেতে হ'ল। রাজা মহারাজ ও তুরীয়ানন্দ আবু রোড স্টেশন পর্যন্ত ট্রেনে তাঁর সঙ্গী হলেন। স্বামীজী ফেরার পথে আবার আবু রোড স্টেশনে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তুরীয়ানন্দকে মঠে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে গেলেন।

আধ্যাত্মিক ভাবে বিভোর রাজা মহারাজ শরীরের যত্ন নিতে জানতেন না, কে তাঁকে দেখবে? তাই তুরীয়ানন্দের ইচ্ছা ছিল না রাজা মহারাজকে ছেড়ে যাবার। কিছুদিন আবু পাহাড়ে সাধন-ভজন করে আজমীর, জয়পুর ঘুরে তাঁরা বৃন্দাবনে এলেন।

বৃন্দাবনে একদিন রাধারাণী উপবাসী রাখেন কিনা দেখবার জন্য দু'জনে ভিক্ষায় বেরোন নি, দিবারাত্র ধ্যানে তন্ময় হয়ে কাটিয়েছিলেন। পরদিন একজন ভক্ত শেঠ অযাচিতভাবে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী দিয়ে যান। আবার একদিন ভিক্ষায় গুড় বা চিনি না পাওয়ায় শুকনো রুটী জলে ভিজিয়ে খাচ্ছিলেন দু'জনে। রাজা মহারাজকে ঠাকুর কি ভাবে ক্ষীর সর ননী খাওয়াতেন, সে কথা স্মরণ করে তুরীয়ানন্দ সেদিন কেঁদে ফেলেছিলেন, কিন্তু রাজা মহারাজের এ সব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগো শহরে ধর্মমহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই মহাসভায় পৃথিবীর নানা দেশ থেকে পণ্ডিত এবং ভক্তেরা সমবেত হয়েছিলেন। সেই সহস্র সহস্র বিদ্বজ্জনের সামনে স্বামীজী হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। তাঁর অপূর্ব ধর্মব্যাখ্যায় এবং বাগ্মিতায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায় আমেরিকার জনসাধারণ; গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর জয়গানে মুখর হয়ে ওঠে সে দেশ। দেখতে দেখতে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের ও তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম। ভারতবর্ষেও প্রবল আগ্রহ ও শ্রদ্ধা দেখা গেল শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যদের সম্বন্ধে। বরানগর থেকে মঠ উঠে এল আলমবাজারে এক দোতলা বাড়ীতে। দক্ষিণেশ্বরে মহাসমারোহে ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি পালিত হ'ল।

বারো

এর পর তুরীয়ানন্দজীর মঠে ফেরবার জন্ত ঘন ঘন তাগিদ আসতে লাগল। স্বামীজীর আদেশ আর অমান্ত করা চলে না। বরানগর এবং আলমবাজার মঠের সঙ্গে তুরীয়ানন্দজীর চিঠিপত্রে খবরাখবর আদান-প্রদান বরাবরই ছিল; এই সব খবর তিনি নিয়মিতভাবেই রাজা মহারাজকে জানাতেন। রাজা মহারাজ খুশী হয়েই তাঁকে বললেন, "আপনি মঠে চলে যান, ঠাকুরের কাজে আপনার ডাক পড়েছে।" বৃন্দাবন থেকে মঠে ফেরার পথে তুরীয়ানন্দজী অযোধ্যা দর্শন করে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁরা দু'জনেই অযোধ্যায় এলেন প্রথমে। সেবার অযোধ্যায় থাকতে এই ঘটনাটি ঘটে—সেদিন একাদশী; তুরীয়ানন্দজী ভিক্ষায় বেরিয়ে মাত্র কতকগুলি গেঁটে কচু-সেদ্ধ পেলেন। তাই খেতে বসলেন মহানন্দে। কিছুটা খেয়েই রাজা মহারাজ চঞ্চল হয়ে উঠলেন গলার কুটকুটুনিতে; তুরীয়ানন্দজীর গলাও ধরে গেছল, কিন্তু তিনি তা চেপে গেলেন। বললেন, "কই, আমার তো তেমন ধরে নি।" তিনি রাজা মহারাজকে চঞ্চল দেখে ব্যস্তভাবে ছুটলেন টকের সন্ধানে। সেই সময় অযোধ্যায় খুব অন্নকষ্ট চলছিল, কোথায় পাবেন তিনি' রাজা মহারাজের জন্ত একটু তেঁতুল বা একটা লেবু? ঘুরতে ঘুরতে তিনি একটা লেবু বাগানে গিয়ে দেখেন, কয়েকজন খটিক (চাষী) খাটিয়ায়

বসে তামাক খাচ্ছে, তিনি তাদের কাছে একটি লেবু চাইলেন। খটিকেরা বললে, 'কোথায় পাব, মহারাজ, লেবু? গাছে ফুল ধরেছে, লেবু একটিও নেই।' তুরীয়ানন্দজী হতাশ হয়ে বাগানের লেবু গাছগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে কিছু দূর যেতেই দেখেন, একটা গাছে একটি পাকা লেবু রয়েছে। তখন তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে খটিকদের কাছে এসে বললেন, "ভাই, আমাদের মহান্ত মহারাজের কচু সেদ্ধ খেয়ে গলা ফুলে গেছে, তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন; গাছে ঐ একটি পাকা লেবু আছে, তোমরা যদি লেবুটি আমায় ভিক্ষা দাও তো বড়ই উপকার হয়।' 'গাছে লেবু ছিল না, এটা আপনার ভাগ্যে মিলেছে' এই কথা বলে খটিকেরা লেবুটি আকশি দিয়ে পেড়ে তাঁর হাতে দিল। কপর্দকহীন সাধু তখন দ্রুতপদে রাজা মহারাজজীর কাছে গিয়ে লেবুটিকে টুকরো টুকরো করে তাঁকে খেতে দিলেন! তাতেই রাজা মহারাজজীর গলার যন্ত্রণা কমে গেল; কিন্তু তাঁর মনে হতে লাগল, গলা যেন ফুলে রয়েছে। হরি মহারাজও এক টুকরো লেবু খেলেন। তারপর তাঁরা যথা-সময়ে ধ্যান ধারণাদি করে রাত্রে শুয়ে পড়লেন। শুলে কি হবে, ঘুম আসে না; রাজা মহারাজের একে গলার যন্ত্রণা, তার উপর ক্ষিদের জ্বালা। মনে মনে ঠাকুরের উদ্দেশে বলতে লাগলেন, "এক মুঠো অন্নই যদি না জুটিয়ে দিতে পারলে, তবে ঘরের বার করছিলে কেন?" অভিমানের সুর ঝংকার দিয়ে উঠল মনের মধ্যে। ভাবতে লাগলেন, "কাল সকালে যদি গরম গরম খিচুড়ি আর চাটনী খাওয়াতে পার, তবেই বুঝব তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ।"

ভোরে উঠে তাঁরা সরযূর লক্ষ্মণবর্জন ঘাটে স্নান করতে গেলেন।

স্নান শেষ করে তীরে উঠতেই দেখেন, একজন রামাইত সাধু হন্তদন্ত হয়ে যেন কাকে খুঁজছেন। তাঁদের দেখেই তিনি জয়রামজী বলে অভিবাদন করে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বামীজী, আপনারা তো কাল থেকে একাদশীর উপোষ করে আছেন? চলুন রামজীর কুটীরে পারণ করবেন। রাজা মহারাজ এবং তুরীয়ানন্দজী পরস্পরের দিকে চেয়ে বললেন, "বাবাজী, এত সকালে আপনি কি পারণ করাবেন? সাধু বললেন, "রামজীকে খিচুড়ি ভোগ লাগিয়ে এসেছি, তাঁর প্রসাদই আপনারা পাবেন।" এই বলে সাধুজী মিনতি করে তাঁদের দুজনকে নিজের কুটীরে নিয়ে গেলেন।

শহর থেকে লক্ষ্মণবর্জন ঘাটে যাবার পথে এক নিমগাছতলায় একটি খড়ের ঝুপড়িতে বাবাজীর আস্তানা। তিনি সেইখানে তাঁদের বসিয়ে দিলেন পাতা করে। গরম খিচুড়ির সঙ্গে আমের, লেবুর এবং তেঁতুলের আচার এল—রামজীর প্রসাদ; খাওয়াটি ভালই হ'ল। সাধু বলতে লাগলেন, "ওহো! আমার কি সৌভাগ্য! আজ চব্বিশ বছর ধরে আমি এইখানে বাস করছি রামজীর একটি বাণী শোনবার জন্য, তাকে একনজর দেখবার জন্য। আজ রামজী আমায় কৃপা করেছেন।" এই বলে বাবাজী কেঁদেই আকুল। মহারাজ তখন সাধুকে বললেন, "বাবাজী, ব্যাপারটা কি একটু খুলেই বলুন।" বাবাজী তখন বলতে লাগলেন, "শেষ রাত্রে কে যেন খুব নরম হাতে আমায় ঠেলে তুলে দিয়ে বললেন, 'ওরে, ওঠ, আমার বড়ো ক্ষিদে পেয়েছে। শীগ্‌গির খিচুড়ি রেঁধে আমার ভোগ দে। আর ভোর বেলা লক্ষ্মণবর্জন ঘাটে গিয়ে দেখবি, আমার দুজন ভক্ত সাধু স্নান করছে; তাদের এনে প্রসাদ খেতে দিবি।'

কুটীরে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল; সাধু শ্রীরাম-চন্দ্রের ছবির দিকে দেখিয়ে বললেন, "আমি স্পষ্ট দেখলাম, এই রামজী হাত দিয়ে আমায় ঠেলে ওঠালেন আর এই কথাগুলি বললেন। তাই আমি স্নান করে খিচুড়ি রেঁধে রামজীর ভোগ চড়িয়ে আপনাদের ডেকে এনেছি। এতদিনে রামজী আমার কৃপা করেছেন আপনাদের দয়ায়।

রাজা মহারাজ ও হরি মহারাজ সাধুর কথা শুনে অবাক। তাঁরাও ভক্তিবিহ্বল চিত্তে, ছলছল নেত্রে রামজীর প্রসাদ পেলেন। ফেরার পথে রাজা মহারাজ পূর্বরাত্রে ঠাকুরের ওপর তাঁর অভিমানের কথা বললেন হরি মহারাজকে।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে তুরীয়ানন্দজী কলকাতায় আলম-বাজার মঠে ফিরে গেলেন। রাজা মহারাজ অযোধ্যা থেকে বৃন্দাবনে গিয়ে আরও বছর খানেক সেখানে সাধন ভজনে মগ্ন রইলেন। এরপর বৃন্দাবনে তিনি অজগর-বৃত্তি নিলেন; ভিক্ষায় যেতেন না, কারও কাছে কিছু চাইতেন না। যেদিন কোন ভক্ত স্বেচ্ছায় কিছু দিয়ে যেতেন, সেদিন আহার জুটত; যেদিন সে রকম কেউ আসত না, সে দিন অনাহারে কাটত। হয়তো কোন শেঠ এসে তার সামনে কম্বল রেখে গেলেন, পরক্ষণেই চোর এসে সেখানি তুলে নিয়ে গেল তার চোখের ওপরেই। তিনি সাক্ষিস্বরূপ দেখলেন, কিছু করার প্রয়োজনও বোধ করলেন না, দিনের বেলা কখনও বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় কাটত, কখনও অশ্রুপুলকাদির সঞ্চার হত। সাধারণতঃ সন্ধ্যার পর কিছু খেয়ে শুয়ে পড়তেন, রাত্রি বারোটার পূর্বে উঠে ধ্যানে বসতেন মহানিশায়। দৈবাৎ কোন দিন উঠতে

দেরী হলে কে যেন ডেকে দিত। "ওঠো, তোমার ভজনের সময় হয়েছে।" তাড়াতাড়ি উঠে হাত মুখ ধুয়ে আসনে ধ্যানে বসবার সময় তিনি দেখতে পেতেন, জনকয়েক বাবাজী তাকে ঘিরে জপে বসেছেন। এই সব বিদেহী পুণ্যাত্মাদের প্রভাবে ধ্যানজপে অবিলম্বে তন্ময়তা আসত তাঁর। একদিন বংশীবটে রাসযাত্রা দেখতে গিয়ে একজন বর্ষীয়ান বাবাজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বাবাজী তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকে পাশে বসান, কিন্তু কথা বলেন না। তিনি আগাগোড়া নৃত্যগীতের মধ্যে জপে রত ছিলেন। রাজা মহারাজ বিগ্রহ দর্শন এবং নৃত্যগীতাদি শ্রবণে যেই একটু তন্ময় হয়ে আসেন, অমনি বাবাজী ঝোলা থেকে মালাশুদ্ধ হাত বার করে মালার মেরুটি তাঁর কপালে ছোঁয়ান। স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সর্বাঙ্গ অপূর্ব পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। মহারাজের বারবার এই রকম অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হল সেদিন।

এমন কতদিন কত ঘটনাই না হয়েছে বৃন্দাবনে থাকতে! শেষ পর্যন্ত ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ারদিকে গুরুভাইদের আহ্বান এল। তাঁর অন্তরও সাড়া দিল সে ডাকে। ঠাকুরের ডাক এসেছে বুঝে তাঁরই আরব্ধ জীবসেবারূপ মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য মহারাজ আলমবাজার মঠে এসে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

তেরো

বহু দিন পরে কলকাতায় ফিরেছেন রাজা মহারাজ। গুরুভাইদের আনন্দ আর ধরে না। মঠের সন্ন্যাসীরা যেন নূতন জীবন পেলেন; প্রবল উৎসাহে ঠাকুরের ভাব এবং বাণী প্রচার করতে কর্মক্ষেত্রে নামলেন তাঁরা। সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে। ঠাকুরের গৃহী শিষ্য এবং ভক্তেরা দলে দলে আসতে লাগলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর উপদেশ শুনতে। তাঁর তপস্যাপূত তেজঃপুঞ্জ শরীর দেখে জুড়িয়ে গেল তাঁদের বুক।

আমেরিকা এবং য়ূরোপে সে সময়ে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী প্রচার করে বেড়াচ্ছেন নগরে নগরে। শত শত জনসভায় লক্ষ লক্ষ নরনারী মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনছে তাঁর অপূর্ব ধর্মব্যাখ্যা, হিন্দুধর্মের দুন্দুভি বেজে উঠছে দেশে দেশে। সমুদ্র পার হ'য়ে সেই গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর জয়ধ্বনি এদেশে এসে পৌঁছুচ্ছে প্রতিদিন, তার প্রতিধ্বনি উঠছে ভারতের প্রান্তে প্রান্তে। সহস্র বৎসরের পরাধীনতার গ্লানি ভুলে মুমূর্ষু ভারত ধূলিশয্যায় উঠে বসেছে তাঁর তাড়িত স্পর্শে, ফিরে পেয়েছে তার আত্মবিশ্বাস, তার স্বধর্মে শ্রদ্ধা। বিদেশের নিকষে যাচাই না হ'লে তো দেশের সোনার দাম বাড়ে না। শ্রীরামকৃষ্ণ পাশে থাকতে যারা ফিরে চায় নি আজ তারা সবাই জানতে চায় তাঁকে, শুনতে চায় তাঁর কথা; তাঁর

শিষ্যদের সম্মান দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় নিজেদের অতীত অপরাধের। ঠাকুরের ভক্তেরা তৎপর হলেন এ বিষয়ে। ভক্ত হরমোহন মিত্র ঠাকুরের বড়ো ছবি ছাপালেন, স্বামীজীর বক্তৃতাবলী ছাপালেন। অন্য ভক্তেরাও সাধ্যমতো লেগে গেলেন প্রচারের কাজে। ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ, তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর কথা, দক্ষিণেশ্বরের কথা পুস্তিকাকারে ছাপা হয়ে বিতরিত হতে লাগল। শিকাগো ধর্মসভার অধিবেশনের পর পাশ্চাত্তাদেশ শ্রদ্ধা দিল ভারতবর্ষকে; ভারতবর্ষ শ্রদ্ধা দিল তার ধর্মকে, তার ধর্মগুরুকে—ধর্মসংস্থাপনের জন্য যিনি যুগেযুগে দেহধারণ করে আসেন—সেই পরম পুরুষকে। রাজা মহারাজ বলরাম মন্দিরে যোগানন্দ এবং প্রেমানন্দকে বললেন, "এমন সময়, এমন যুগ তো আর সহজে মিলবে না। তোমাদের জীবন, তোমাদের মঠ দেখে জগতের লোক জুড়ুতে আসবে,—ঠাকুরের আশ্রয় নিয়ে তারা ত্রিতাপজ্বালা থেকে শান্তি পাবে।" প্রথমতঃ বাংলার নরনারীকেই ঠাকুরের এবং স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত করতে লেগে গেলেন রাজা মহারাজ নিজে। যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করতে লাগল তাঁর নির্দেশ তাঁর গুরুভাইদের এবং ভক্তদের মধ্যে ভারতের প্রান্তে প্রান্তে।

বহুজনহিতায় কর্মক্ষেত্রে নামবার কিছুদিনের মধ্যেই রাজা মহারাজ তাঁর একমাত্র পুত্রের এবং পিতার মৃত্যুসংবাদ পেলেন। তার পাঁচ বছর আগেই সাধ্বী পত্নী সাধনোচিত ধামে চলে গেছলেন পৃথিবী ছেড়ে। মাতৃহারা, পিতৃস্নেহবঞ্চিত বালক তার পিতামহের কাছেই থাকত বেশীরভাগ সময়; তাঁরই স্নেহের আওতায় বড় হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। হঠাৎ তার অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর

বৃদ্ধ পিতামহ আনন্দমোহন ভেঙে পড়লেন একেবারে এবং অল্পদিনের মধ্যেই পৌত্রের পথ অনুসরণ করে নরদেহ ছেড়ে গেলেন। এই সব খবরে কিছু বিচলিত হলেন রাজা মহারাজ। অধ্যাত্মরাজ্যের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছেন তিনি, স্থিতপ্রজ্ঞ জিতশোক মহাপুরুষ তিনি; তবু তিনি দেহধারী মানুষ, দেহের ধর্ম যাবে কোথায়? দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ভাইপো অক্ষয় যখন মারা যান, তখন ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন তাঁর মৃত্যুশয্যায়। তাঁরই শ্রীমুখের কথা—একজন দেহ ছেড়ে যাচ্ছে, রক্তমাংসপুঁজের খাঁচা থেকে মুক্তি পাচ্ছে, দেখে প্রথমটা বেশ আনন্দ পাচ্ছিলেন ঠাকুর। কিন্তু যখন অক্ষয়ের দেহ শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গেল, তখন আর ধৈর্য রইল না তাঁর। বললেন, "তখন দেখি ভিতরে যেন গামছা নিংড়ুচ্ছে।" তাঁর মত যুগাবতারের লীলায় এই অবস্থা, অন্যে পরে কা কথা! তবু প্রাকৃত জনের মতো শোকে অধীর হলেন না রাজা মহারাজ। কর্তব্যে অবহেলা করবার পাত্র নন তিনি। সর্বসৃষ্টির নিয়ন্তা প্রভুকে তিনি জেনেছেন, অমৃত পান করেছেন তিনি, এই মর জগতের প্রত্যেক জীবকে সেই অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করাবার জন্য ব্যাকুল তাঁর অন্তর। মৃত্যু কি তাঁকে অভিভূত করতে পারে?

বহুদিন নির্জন তপস্যায় কেটেছে ধর্মবীরের। এইবার কর্মবীর ব্রহ্মানন্দ দেখা দিলেন স্বামী বিবেকানন্দের দক্ষিণহস্তরূপে বিশাল জনসমুদ্রের মাঝখানে দিঙ্‌নির্দেশক আলোকস্তম্ভরূপে।

ওদিকে শ্রীশ্রীমার শরীর ভালো যাচ্ছে না; জয়রামবাটী কামার-পুকুর তো ম্যালেরিয়ার ডিপো, সেখানে ভাল থাকাটাই অস্বাভাবিক। রাজা মহারাজ মার জন্য বাসা ভাড়া করে তাঁকে ক'লকাতায়

নিয়ে এলেন। বাগবাজারে গঙ্গার ধারে তেতলা বাড়ী; একতলায় হলুদের গুদাম, দোতলায় বাস করা চলে। লোকে বলত 'গুদাম বাড়ী'। শ্রীশ্রীমা থাকেন তেতলায়। গোলাপ-মা, যোগেন-মা, গোপালের মা প্রভৃতি স্ত্রীভক্তেরা তাঁর সঙ্গে থাকেন। বাড়ীটি বেশ, ঘরে বসে গঙ্গা দেখা যায়। মার পরিচর্যার জন্য যোগানন্দ এবং আর দু'একজন সাধু ব্রহ্মচারীকে নিয়ে রাজা মহারাজ নিজে দোতলায় রইলেন। দোতলায় একটি বড়ো ঘরে ভক্তেরা যাতায়াত করেন, সেখানে রাজা মহারাজ রোজ ভগবৎপ্রসঙ্গে নানা আলোচনা করেন সকলের সঙ্গে, অধিকারী বুঝে দীক্ষাও দেন কাউকে কাউকে। ভক্ত এবং নির্বিকল্পসমাধিবান সাধক ক্রমে গুরুর পদ নিচ্ছেন—আচার্যের ভূমিকায় দেখা দিচ্ছেন। এর পর বলরামের গৃহে, আলমবাজারে, বেলুড় মঠে, নীরবে শত শত জীবনে অধ্যাত্মসম্পদ বাড়িয়ে চলেছেন তিনি। ঠাকুর বলতেন, "ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি আসে।" সত্যই তাই। সরল, সহজ, নিরভিমান সাধক তিনি—গুরু হবার, অন্যের পূজো পাবার কোন লোভই তাঁর অন্তরে ছিল না; কিন্তু ঠাকুরের দয়ায় তাঁর গুরুভাব যেদিন বিকশিত হ'ল, সেদিন থেকে নিত্য নূতন ভক্তসমাগমের বিরাম রইল না। বলরাম ভবন এবং গুদাম বাড়ী তীর্থ হয়ে উঠল। এই সময় বলরাম ভবনে তিনি গুরুভাই স্বামী যোগানন্দের সঙ্গে প্রায়ই ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। ভক্তেরা তাঁদের খেতাব দিয়েছিলেন 'রাজা আর মন্ত্রী'। যাঁরা আসতেন তাঁদের প্রত্যেকেই রাজা মহারাজের মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ভাবতেন, তিনি তাঁকেই সকলের চেয়ে বেশী ভালোবাসেন। সকলেই তাঁর প্রিয়কার্যসাধনের জন্য, তাঁর

উপদেশপালনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতেন। ভক্তদের সঙ্গে ধর্মালোচনা এবং নিজের ধ্যানধারণা ছাড়া রাজা মহারাজের এখন থেকে প্রধান কর্ত্তব্য হ'ল ঠাকুরের ভাব ও বাণী প্রচার করা। স্বামীজী যে কাজ বহির্ভারতে আরম্ভ করেছিলেন, রাজা মহারাজ সেই কাজই স্বদেশের সর্বত্র আরম্ভ করতে উদ্যোগী হলেন। তাঁর নেতৃত্বে তাঁর গুরুভাইরা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে অনাড়ম্বর অথচ ব্যাপক-ভাবে কাজ আরম্ভ করলেন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। ক'লকাতার পাড়ায় পাড়ায় স্বামী ত্রিগুনাতীতানন্দ নিয়মিতভাবে গীতার ক্লাস করতেন এবং আলোচনার দ্বারা ঠাকুরের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। ক'লকাতার নানা পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমিতি স্থাপিত হতে লাগল।

স্বামীজীর ডাকে স্বামী সারদানন্দ ১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল লণ্ডনে পৌঁছেন, এবং অভেদানন্দজী আগস্ট মাসে লণ্ডন যাত্রা করলেন।

চোদ্দ

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে খবর এল, স্বামীজী শীঘ্রই দেশে ফিরবেন। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মান্দোলনের বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যা কমে এলেও নিতান্ত নগণ্য ছিল না; নানা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রচারকগণ এবং পত্রিকা-সম্পর্কিত দল বাধা দিচ্ছিলেন ঠাকুরের ভক্তদের নানাকারণে নানাভাবে। কিন্তু স্বামীজীর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের দিনে স্রোতের মুখে তৃণের মতো ভেসে গেল সব বাধা। ভক্তেরা রাজা মহারাজকে ধরলেন, ক'লকাতায় স্বামীজীর যথোচিত অভ্যর্থনা হওয়া চাই। সিংহলে এবং পথের সর্বত্র বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়ে স্বামীজী ক'লকাতায় পৌঁছুলেন। ক'লকাতায় রাজা মহারাজের উৎসাহে ইতিমধ্যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছিল। খিদিরপুর থেকে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রমুখ সাধু ভক্তেরা এগিয়ে নিয়ে এলেন স্বামীজীকে স্পেশাল ট্রেনে। ট্রেন থেকে নামতেই রাজা মহারাজ তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, গলায় একটি সুন্দর ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে। স্বামীজী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই নতজানু হয়ে মহারাজের পায়ের ধুলো নিলেন, হেসে বললেন, "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।" মহারাজও সঙ্গে সঙ্গে তেমনি করে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে হেসে বললেন, "জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা।" তারপর দুজনে বদ্ধ হলেন প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গনে। সে

এক অপার্থিব দৃশ্য! সেদিনের আনন্দ-মিলন যে দেখেছে, সে জীবনে ভুলবে না।

শিয়ালদহ থেকে সমস্ত রাজপথ জয়ধ্বনিমুখর। নরচন্দ্রমার পুণ্য আকর্ষণে উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে মহানগরীর জনসমুদ্র। পথে তিলধারণের জায়গা নেই, দু'পাশের বাড়ীর বারান্দায়, ছাদে, গাছের ওপর হাজার হাজার মানুষের ভিড়; শহরের লোক ভেঙে পড়েছে দেশের মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তানকে স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনা জানাতে। আটঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া খুলে কলেজের ছাত্রেরা টানতে আরম্ভ করেছে, শতশত উৎসাহী যুবক মাইলের পর মাইল টেনে নিয়ে চলেছে স্বামীজীর সেই পুষ্পপল্লবভূষিত জয়রথ। ক'লকাতায় সে এক অভূতপূর্ব সমারোহ। পথে পথে সর্বসাধারণের শুভ কামনা এবং সুবিপুল শ্রদ্ধার্ঘ্য সংগ্রহ করতে করতে চলেছেন স্বামীজী: ফুলের মালায় গাড়ী বোঝাই, বাগবাজারে পশুপতি বসুর প্রাসাদোপম অট্টালিকার দরজায় এসে শেষ পর্যন্ত থামল শোভাযাত্রা। রাজা মহারাজ সেইখানেই সাময়িকভাবে স্বামীজীর থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

স্বামীজী দীর্ঘকাল শক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রম করে এসেছেন, বড়ো ক্লান্ত তিনি। মহারাজ বুঝলেন ক'লকাতার জনকোলাহল থেকে তাঁকে দিনের মধ্যে অন্ততঃ কিছুক্ষণ সরিয়ে রাখতে হবে, বিশ্রাম দিতে হবে। অভ্যর্থনা সমিতি স্বামীজীর ও তাঁর পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদের জন্য কাশীপুরে গোপাল শীলের বাগানবাড়ী ভাড়া করেছিলেন। সেখানে সারাদিন ধর্মালোচনা করে স্বামীজী আলমবাজার মঠে ফিরে যেতেন প্রতি সন্ধ্যায়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী

কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ীতে নগরবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে মানপত্র দেওয়া হয়; তিনি তার উত্তরে একটি সারগর্ভ অভিভাষণ দেন। তারপর স্টার রঙ্গমঞ্চে বেদান্ত সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দেন।

রাজা মহারাজ দেখলেন, স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে দিন দিন; তিনি আর তাঁকে বক্তৃতা করতে দিলেন না। ডাক্তারের পরামর্শে হাওয়া বদলাবার এবং বিশ্রাম দেবার জন্য তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তুরীয়ানন্দ স্বামী শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের পর শিষ্যসেবক এবং গিরিশ বাবু সহ দার্জিলিং যাত্রা করলেন। ক'লকাতায় ফিরে স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্ত্যদেশ থেকে সংগৃহীত সমস্ত টাকাকড়ি রাজা মহারাজের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, "এতদিন যার জিনিস আমি বয়ে বেড়িয়েছি, আজ তাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।"

ঠাকুরের জীবন ও বাণী যে মহাতত্ত্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, মানুষের দৈহিক, মানসিক এবং পারমার্থিক উন্নতির জন্য তার প্রয়োজন ছিল এবং আজও আছে, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের জন্ম। দার্জিলিং-এ স্বামীজী, তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি মিলিতভাবে যেদিন এর পরিকল্পনা করলেন, তার কয়েকদিন পরেই একে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য তাঁরা ক'লকাতায় চলে এলেন। ১৮৯৭ সালের ১লা মে বলরাম মন্দিরে ঠাকুরের ভক্ত-শিষ্যবৃন্দ মঠের সন্ন্যাসীদের ডেকে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হ'ল। স্বামীজী হলেন সংঘের সাধারণ সভাপতি; রাজা মহারাজ রইলেন ক'লকাতা কেন্দ্রের সভাপতি, সারদানন্দ হ'লেন সম্পাদক। প্রতি রবিবারে অধিবেশন হবে স্থির হল। স্বামীজী এই যে স্বাস্থ্যলাভের জন্য

আলমোড়া চলে গেলেন, রাজা মহারাজকেই অবিলম্বে কর্মক্ষেত্রে নামতে হ'ল। শিবানন্দ সিংহলে, রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে, যোগানন্দ আলমোড়ায়, ত্রিগুণাতীতানন্দ মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুরে এবং অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে প্রচারের কাজ চালাতে লাগালেন; স্বামী প্রেমানন্দ রইলেন মঠের তত্ত্বাবধানের জন্য আলমবাজারে। রাজা মহারাজ এই সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মূলে রইলেন ক'লকাতায়। মঠ-পরিচালনার ওপর আবার সেবাকার্যের দায়িত্ব এল। স্বামী অখণ্ডানন্দ খবর দিলেন মুর্শিদাবাদে দারুণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়েছে, অনাহারে মরছে বহু লোক। মহারাজ অর্থ পাঠালেন, লোক পাঠালেন। সন্ন্যাসীদের সেবাকার্য দেখে মুগ্ধ হয়ে রাজকর্মচারীরা সুপারিশ করায় সরকার সস্তা দরে চাল দিলেন তাঁদের। রাজা মহারাজ অখণ্ডানন্দকে উৎসাহ দিয়ে লিখলেন, "Heart-এর devolopment (হৃদয়ের বিকাশ) না হইলে কোনো কাজই হয় না। তোমাদের এইপ্রকার কার্য মহান হৃদয়ের পরিচায়ক। 'ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ'—এই মহান শ্লোকের যথার্থ application (প্রয়োগ) তোমাদের কার্যে দেখা যাইতেছে। তোমরা আরও উৎসাহের সহিত কার্য কর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নিঃস্বার্থভাবে কোন কাজে ব্রতী হইলে স্বয়ং ভগবান তাহার সহায়তা করেন।" দুর্ভিক্ষ-নিবারণের কাজ শেষ হলে প্রথমে মহুলায়, পরে সারগাছিতে, স্থায়িভাবে অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'ল। মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষের আগুন না নিবতে নিবতে দিনাজপুরে সহস্র সহস্র মানুষ জ্বলতে লাগল জঠর-জ্বালায়। স্বামী ত্রিগুণাতীতকে পাঠালেন সেখানে মহারাজ, তিনি বহুলোকের জীবন রক্ষা করলেন সময়োচিত সাহায্য দিয়ে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মানপত্র

দিলেন তাঁর ভূয়সী প্রশংসা ক'রে, কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁর মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনলে। ক্রমে ক'লকাতার কাছে আলমবাজারে, দক্ষিণেশ্বরে অনেক দুঃখী লোককে মিশনের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হ'ল। রাজা মহারাজ স্বামী বিরজানন্দকে দেওঘর পাঠালেন দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য। সেখানে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ শেষ করে এলেন। মিশন-প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই সন্ন্যাসীদের সেবাকার্যের সুখ্যাতি, জাতিধর্মনির্বিশেষে মানবকল্যাণের জন্য তাঁদের জীবনপণের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল ভারতের সর্বত্র, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলে সর্ব মানবের।

রাজা মহারাজ এই সময়ে যেন একা শতহস্ত হয়ে কাজ করছেন। মঠের জন্য জমির সন্ধান, উকিল অ্যাটর্ণির পরামর্শ নেওয়া, গুরুভাইদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, শ্রীশ্রীমার সেবা, পাশ্চাত্ত্য অতিথিদের সৎকার, মঠের সন্ন্যাসী ও নবাগত ভক্তদের অধ্যাত্ম-জীবনের সহায়তার জন্য ধর্মালোচনা, বাংলা পাক্ষিক পত্র-পরিচালনার এবং মিশনের অধিবেশনের নিয়মিত আয়োজন, চিঠিপত্রের দ্বারা বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগরক্ষা, মঠের ব্যয়নির্বাহের এবং সেবাকার্যের জন্য অর্থসংস্থান ও হিসাবরক্ষা—সবের মধ্যেই তিনি আছেন, অথচ তাঁর মুখে কর্মচাঞ্চল্যের কুঞ্চিত রেখা কেউ দেখে নি এক দিনের জন্য। তিনি ছিলেন চিরপ্রসন্ন, আনন্দঘনমূর্ত্তি, নিরাশী, নির্মম, দ্বন্দ্বাতীত পুরুষ, নেতৃত্বাভিমানহীন নেতা, কর্তব্যে অটল কর্মী। এক শ্বেতাঙ্গ ভক্তকে স্বামীজী বলেছিলেন, "এখানে একটা ডাইনামো চলেছে, আমরা সকলে তার অধীনে আছি।" তিনি রাজা মহারাজের উদ্দেশে ঐ কথা বলেছিলেন, সাধকের আধ্যাত্মিক

জীবনের বিকাশই আসলে ঠাকুরের শিক্ষা জনসমাজে প্রচারের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠপথ। বক্তৃতা প্রভৃতি গৌণ। স্বামীজী একথা বুঝতেন, তাই ঠাকুরের মানসপুত্রকে বসিয়েছিলেন সংঘের কেন্দ্রস্থলে। স্বামীজীর পাণ্ডিত্য তাঁর ছিল না, কিন্তু অধ্যাত্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। স্বামীজী বলতেন, "রাজার spirituality (আধ্যাত্মিকতা) আঁকড়ে পাওয়া যায় না। রাজা আমাদের মঠের প্রাণ; সত্যিই আমাদের রাজা।" ঠাকুরের কথা ঠাকুরের মতোই প্রাণস্পর্শী, সহজ, সরল ভাষায় তিনি বলতেন সকলের কাছে। আপনার ব'লতে তিনি তো কিছু রাখেন নি; তাই ঠাকুরই বসেছিলেন তাঁর দেহমন জুড়ে, ঠাকুরই যেন কথা বলতেন তাঁর মুখ দিয়ে।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম সপ্তাহে অমরনাথ-দর্শনের পর লাহোরে ফিরে স্বামীজীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ায় তাঁকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে গিরিশ বাবু প্রভৃতি ভক্তেরা বিকালের দিকে খোঁজ নিতে এসেছেন। হঠাৎ স্বামীজী রোগশয্যা থেকে উঠে আস্তে আস্তে বাইরের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। গিরিশ বাবু চমকে উঠে বললেন, "একি স্বামীজী, তুমি নীচে নেমে এলে যে? শুনলুম তোমার বড়ো অসুখ।" স্বামীজী বললেন, "কি করি বলো? শুয়ে শুয়ে যতবার চোখ মেলেছি, দেখি রাজা প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে আছে। তার মুখ খানার সেই ভাব দেখে আর শুয়ে থাকতে পারলুম না, আস্তে আস্তে উঠে এলুম। আমি হাঁটছি বেড়াচ্ছি দেখে রাজার মুখে যদি হাসি বেরোয়।" একটু পরেই রাজা মহারাজ ব্যস্ত হয়ে এসে বললেন, "তুমি উঠে এলে যে? শরীর কিছু ভাল বোধ হচ্ছে?" স্বামীজী গিরিশ বাবুর দিকে

তাকিয়ে বললেন, "রাজা শালা আমাকে রোগী করে রাখতে চায়। রোগ-ফোগ কি? যা, আমি এখন বেশ ভালো আছি।" গুরু-ভাইকে ক্ষণিক আনন্দ দেবার জন্য স্বামীজী নিজের রোগযন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে হেঁটে বেড়াচ্ছেন—এ এক অপার্থিব দৃশ্য। স্বামীজীর ছিল মহারাজের উপর অগাধ বিশ্বাস—অসীম নির্ভর।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রার দিন স্বামীজী মঠ-মিশনের সমস্ত সম্পত্তি তাঁর নামে লিখে দিতে গিয়েছিলেন, রাজা মহারাজ তাতে সম্মত না হওয়ায় শেষে গুরু-ভাইদের ট্রাষ্টি নিয়োগ করা হয়। বিদেশ থেকে নিজের পদত্যাগকালে রাজা মহারাজকে মঠের সভাপতি নির্বাচিত করে স্বামীজী লিখেছিলেন, "রাখাল, আজ হতে সব তোর, আমি কেউ নই।" আবার রাজা মহারাজেরও ছিল তাঁর উপর অপার শ্রদ্ধা, অসীম ভালোবাসা। স্বামীজী বুঝেছিলেন, পৃথিবীতে তাঁর গোণা দিন ফুরিয়ে আসছে, তাই তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন কাজ তাড়াতাড়ি না এগুলে তাঁর ধৈর্য-চ্যুতি হত, এবং বিরক্তি ও ক্রোধের সমস্ত অত্যাচারটা পড়ত রাজা মহারাজের ওপর; তিনি নীরবে সইতেন গুরুভাই-এর ভৎর্সনা। পরক্ষণেই অনুতপ্ত স্বামীজী ক্ষমা চাইলে বলতেন, "তুমি অমন করছ কেন? আমায় গালাগাল দিয়েছ, তাতে হয়েছে কি? তুমি ভালোবাস, তাইতো এ সব বলেছ।" এ ব্যাপার একবার নয়, বার বার ঘটেছে। রাগলে স্বামীজীর জ্ঞান থাকত না, যা তা বলতেন। তাঁর স্বাস্থ্যের কথা স্মরণ করে কোনদিন মহারাজ স্বামীজীর অন্যায় ভৎর্সনার প্রতিবাদ করতেন না। বেশী কষ্ট হলে সরে গিয়ে নীরবে কাঁদতেন। প্রতিবারই স্বামীজী ক্ষমা চাইতেন রাগ পড়ে

গেলে। একবার খাবার কিনে নিয়ে ছুটেছিলেন বলরাম বাবুর বাড়ী মহারাজের মানভঞ্জন করতে। একবার চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমি মুখে যাই বলি না কেন, তুমি আমার অন্তর জানো।" সকলের সামনে বার বার বলেছেন, "আমাকে সবাই ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু আমি জানি রাজা আমাকে কখনও ছাড়বে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘরূপ পুণ্যময় মহাদ্রুমের মূল বিবেকানন্দ, স্কন্ধ ব্রহ্মানন্দ; এক অলৌকিক প্রেমবন্ধনে বদ্ধ এই দুই মহাপুরুষ পরস্পরের অনুপূরক। পরস্পরকে অবলম্বন করেই ঠাকুরের কাজে সার্থক হয়েছেন এঁরা দুজনে।

পনরো

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবের পর থেকেই তাঁর বাণী এবং ভাব-প্রচারের জন্য একটি মঠপ্রতিষ্ঠার সংকল্প স্বামীজীর মনে ছিল। সেজন্য উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য তিনি গোড়ায় পান নি। আমেরিকায় ধর্মপ্রচারকালে কিছু অর্থের সংস্থান হতেই স্বামীজী গুরুভাইদের চিঠি দিলেন গঙ্গার ধারে জমি দেখবার জন্য। 'পুঁজি অল্প কিন্তু ছাতি বড়ো বেজায়।' দেশে ফিরেই স্বামীজী রাজা মহারাজের ওপর জমি পছন্দ করবার এবং কেনবার ভার দিলেন। বেলুড়ের বর্তমান মঠের জমিটি পছন্দ হ'ল সবারই; বিশেষ ক'রে সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বরের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখা যায় বলে স্থানটি সকলকে আকৃষ্ট করলে। উনচল্লিশ হাজার টাকায় উনিশ বিঘা জমি কেনা হ'ল। মঠের উদ্দেশ্যে যে টাকা তোলা হয়, তার মধ্যে স্বামীজীর শিষ্যা মিস্ মুলার একাই চল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। কাজের সুবিধার জন্য আলমবাজার থেকে মঠ অস্থায়িভাবে স্থানান্তরিত হ'ল বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর ভাড়া বাড়ীতে। এঞ্জিনিয়ার হরিপ্রসন্ন সরকারী চাকরী ছেড়ে সবে আলমবাজার মঠে যোগ দিয়েছেন। তাঁর উপরেই পড়ল মঠবাড়ী-নির্মাণের ভার। রাজা মহারাজ কোথায় কি করতে হবে, তার নির্দেশ দিতে লাগলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর ৺কালীপূজার দিন শ্রীশ্রীমা মহিলা-ভক্তদের নিয়ে মঠ দেখে গেলেন।

৯ই ডিসেম্বর শুভদিন দেখে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করা হ'ল মঠে; স্বামীজী এবং রাজা মহারাজ অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে মঠে ঢুকলেন সেদিন। ১৮৯৯ সালের ২রা জানুয়ারী নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়ী ছেড়ে সমস্ত সাধু ব্রহ্মচারী নূতন মঠে উঠে এলেন।

ক'লকাতায় ছাপাখানা কেনা হয়েছে ইতিমধ্যে। ১৪ই জানুয়ারী সংঘের বাংলা মুখপত্র পাক্ষিক 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হ'ল স্বামী ত্রিগুণাতীতজীর সম্পাদনায়। পূর্ব বৎসরেই ভগিনী নিবেদিতা ৭নং বোসপাড়া লেনের একটি জীর্ণ ভাড়াটে বাড়ীতে বালিকা বিদ্যালয় খুলেছেন। চতুর্দিকে কাজের এবং আনন্দের স্রোত বইছে, এমন সময় হঠাৎ স্বামীজীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে প'ড়ল। চিকিৎসকদের পরামর্শে ১৮৯৯ সালের ২০শে জানুয়ারী তিনি পুনর্বার পাশ্চাত্ত্য দেশে যাত্রা করলেন, সঙ্গে গেলেন নিবেদিতা এবং তুরীয়ানন্দ। য়ুরোপে থাকতে থাকতেই স্বামীজী চিঠি লিখে রাজা মহারাজকে সংঘের সমস্ত ভার অর্পণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আজীবন সভাপতিরূপে রাজা মহারাজ সে দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন।

বিদেশে স্বামীজীর ভাঙা স্বাস্থ্য আর জোড়া লাগল না। দু'বছর য়ুরোপ-আমেরিকার নানা স্থান ঘুরে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী কাউকে কোন খবর না দিয়ে তিনি হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন বেলুড় মঠে। দিন কতক বড়ো আনন্দে কাটল।

মঠে স্বামীজী পুষেছেন 'বাঘা' কুকুর আর 'মটরু' ছাগল, ভেড়া, হরিণ প্রভৃতি পশু; ওদিকে রাজা মহারাজ করেছেন ফলফুলের বাগান, সবজীর ক্ষেত। স্বামীজীর পোষা জন্তুদের ছিল সেদিকে

প্রবেশ-নিষেধ ; কিন্তু নিষেধ করলেই কি অবোধ পশু মানে ? মটরু বাবা প্রভৃতি রাজা মহারাজের এলাকায় গিয়ে নিত্য উৎপাত করে, ফলে স্বামীজীতে মহারাজে লেগে যায় প্রণয়-কলহ। সে কি ছেলেমানুষি কাণ্ড ! মঠের লোক হেসে খুন ব্যাপার দেখে। শেষে স্বামীজীকে গণ্ডী টানতে হ'ল তাঁর পোষ্যদের বিচরণক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করে। স্বামীজীর ছিল জন্তু পোষার সখ ; রাজা মহারাজের ছিল বাগান করার, গাছ গাছড়া দিয়ে বাসভূমিকে মনোরম করে সাজানোর আগ্রহ। তাঁদের লোক-দেখানো ঝগড়ায় পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা প্রকাশ পেত।

স্বামীজী বলতেন, "ভারতবর্ষের একটি মহৎ দোষ, আমরা কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি না, তার কারণ আমরা অন্যের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে চাই না।" তিনি বুঝেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘকে স্থায়ী ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে একমাত্র রাজা মহারাজই সক্ষম ; তাই তাঁকে লিখেছিলেন, "এমন মেশিন খাড়া করো যে আপনি আপনি চলে যায়, যে মরে বা যে বাঁচে।"

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মঠে প্রথম প্রতিমায় দুর্গাপূজা হয়। পূজোর পাঁচ দিন আগেও কিছু ঠিক ছিল না। মঠের সামনে গঙ্গার ধারে বসেছিলেন রাজা মহারাজ, দেখলেন মা দুর্গা দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে গঙ্গার ওপর দিয়ে হেঁটে এসে বেলুড় মঠের বেলতলায় উঠলেন। পরক্ষণেই স্বামীজী নৌকা করে এসে হাজির হলেন। বললেন—তিনি ভাবচক্ষে দেখেছেন, মঠে দুর্গাপূজা হচ্ছে। হৈ হৈ পড়ে গেল মঠে। শ্রীশ্রীমা অনুমতি দিলেন। তাঁর নামে সঙ্কল্প করে মহা-সমারোহে পূজার ব্যবস্থা হ'ল। হাজার হাজার লোক ঠাকুর দেখলে,

প্রসাদ পেলে। প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকায় উঠে রাজা মহারাজ ভাববিভোর চিত্তে ৺মহামায়ার সামনে নাচতে আরম্ভ করলেন। শত শত দর্শক মুগ্ধ চক্ষে দেখলে সেই নাচ, মঠের বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বামীজী স্বয়ং দেখলেন। মনে এল, ব্রজের রাখালরাজ নাচছেন মা যশোদার সামনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে। দুর্গাপূজার পর প্রতিমায় লক্ষ্মীপূজো এবং কালীপূজো হ'ল। স্বামীজী মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করলেন রাজা মহারাজের সুব্যবস্থার।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে জাপানী শিল্পী ওকাকুরার অনুরোধে স্বামীজী তাঁর সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় যান। সঙ্গে গেলেন নিবেদিতা এবং ধর্মপাল প্রভৃতি। সেখানে যাবার আগেই কাশীতে বাড়ী ঠিক করা হয়েছিল তাঁদের জন্য। বুদ্ধগয়া থেকে কাশীতে গিয়ে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাড়ীতে স্বামীজী মাস দুই কাটালেন। কয়েকটি উৎসাহী যুবক কিছু দিন আগে থেকে তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাশীতে আর্তসেবার কাজ চালাচ্ছিলেন। স্বামীজী তাদের উৎসাহ দিলেন, উপদেশ দিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠানটির 'সেবাশ্রম' বা 'হোম অব সার্ভিস' নামাকরণ করে রাজা মহারাজকে লিখলেন, "রাজা, কাশীর প্রতিষ্ঠানটির ওপর দৃষ্টি রেখো।"

কাশীতে প্রথমটা ভালোই ছিলেন স্বামীজী, তারপর আবার বেড়ে গেল অসুখ। ঠাকুরের জন্মোৎসবের আগেই মঠে নিয়ে আসা হ'ল তাঁকে। সেখানে রাজা মহারাজ অন্যান্য গুরুভাই এবং সেবকদের সঙ্গে পালা করে দিবারাত্রি সেবা করলেন তাঁর। এমন সেবা তিনি বোধ হয় ঠাকুরেরও করেন নি। রোগ একটু ভালোর দিকে যাচ্ছে মনে হল, রাজা মহারাজের আনন্দ ধরে না। এক দিন

স্বামীজীর ভিক্ষার খেতে সাধ হ'ল; রাজা মহারাজ অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দল বেঁধে ভিক্ষা করে আনলেন। স্বামীজী সকলের আনা জিনিস কিছু কিছু খেয়ে বললেন, "মাঝে মাঝে এই রকম মাধুকরী ভিক্ষা করতে তোমরা ভুলো না।"

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই। গুরুভাই এবং সেবকদের প্রাণপণ সেবা এবং আন্তরিক প্রার্থনা ব্যর্থ করে স্বামীজী সেদিন আলোক-তীর্থের পথে যাত্রা করলেন। মহারাজ মঠের কাজে কলকাতায় বলরাম মন্দিরে গিয়েছিলেন সেদিন; সেই নিদারুণ খবর পেয়ে গভীর রাত্রিতে ফিরে এলেন মঠে, আছড়ে পড়লেন তাঁর বুকের ওপর। সারদানন্দ অনেক কষ্টে তাঁকে ধরে তুললেন। স্বামীজীর প্রাণহীন দেহ ছেড়ে এসে আকুল কণ্ঠে মহারাজ বলে উঠলেন, "সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড় অদৃশ্য হ'য়ে গেল।" সত্যিই হিমালয়। ব্রহ্মতেজের হিমালয়, ক্ষাত্রবীর্যের হিমালয়, আত্ম প্রত্যয়ের হিমালয়, ভারতবর্ষের তপোমহিমার হিমালয় চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়ল অকালে, অকস্মাৎ। ধর্মবন্ধুদের কাঁদিয়ে, দেশকে কাঁদিয়ে, পৃথিবীকে কাঁদিয়ে, বিবেকানন্দ আনন্দধামে গেলেন। ব্রহ্মানন্দের চোখে অন্ধকার হয়ে গেল জগৎ, নিবে গেল মরজীবনের দীপ্ত আনন্দ-দীপ-শিখা।

বাবাপ্রেমানন্দের পবিত্র মূর্তি

ষোল

রাজা মহারাজ আচার্যপদে বসলেন। আত্মার আত্মীয় স্বামীজীর বিয়োগ-বেদনায় মুহ্যমান হয়েছিলেন কয়েক দিন, তারপর তাঁর আরব্ধ কাজে—ঠাকুরের প্রিয়কার্যে-আত্মনিবেদন করে জয় করলেন শোককে। কাজ কি একটা? শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের মধ্য দিয়ে যে আধ্যাত্মিক মহাশক্তির উদ্বোধন করে গেছেন স্বামীজী, তাকে বাঁচাতে হবে, বাড়াতে হবে, ছড়াতে হবে। একসঙ্গে চাই কর্মক্ষেত্রের বিস্তার এবং ধর্মজীবনের গভীরতা বৃদ্ধি। দলে দলে যুবক আসছে ত্যাগধর্মের দীক্ষা নিতে, তাদের অধিকারিভেদে বিভিন্ন রকম উপদেশ দিতে হবে; নগরে নগরে ঠাকুরের ভক্তসংখ্যা বাড়ছে, নিত্য নূতন প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে ঠাকুর ও স্বামীজীর প্রেরণায়, সেগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে। শুধু সিদ্ধসাধক হলেই আচার্য হওয়া যায় না। যিনি মুক্ত, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁর কাছে সমস্ত জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা; কিন্তু আচার্যকে নিত্য এবং লীলা এই উভয় অবস্থার মাঝখানে সেতুস্বরূপ হয়ে থাকতে হয়। না হলে তাঁর পক্ষে উপদেশ দেওয়া সম্ভব হয় না। রাজা মহারাজ কর্মযোগী, এবার তাঁর তপস্যা চলল জগদ্ধিতায়।

স্বামীজী বেলুড়ে, মাদ্রাজে এবং মায়াবতীতে মঠ স্থাপন করে গিয়েছিলেন; তাছাড়া তিনি কাশীর অদ্বৈতাশ্রমের গোড়াপত্তন

করে এবং কাশী ও কনখলে সেবাশ্রমের সূত্রপাত দেখে গেছলেন। নিবেদিতা বিদ্যালয়ে স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্যা নিবেদিতা তাঁর জ্ঞানতপস্যার হোমাগ্নি জ্বালিয়ে রেখেছেন। উত্তরে হরিদ্বারে, প্রয়াগে ও বৃন্দাবনে এবং দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে সাধকের দল কেন্দ্র স্থাপন করছেন একটির পর একটি। রাজা মহারাজ প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত; লোক দিয়ে, অর্থাগমের উপায় বলে দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছেন প্রত্যেকটি শুভকর্ম প্রচেষ্টাকে, দৃঢ় করে তুলেছেন তাদের ভিত্তি। লোক চেনবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ। যেখানে যাঁকে রাখলে ঠিক কাজ চলবে, সেখানে তাঁকে পাঠাচ্ছেন যাচাই করে। নবেম্বরে স্বামীজীর পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী ত্রিগুণাতীতানন্দ ক্যালিফর্নিয়া যাত্রা করলেন। তিনি ছিলেন 'উদ্বোধন' পত্রের সম্পাদক। তাঁর অনুপস্থিতিতে কাগজখানি উঠে যাবার উপক্রম হ'ল অর্থাভাবে; রাজা মহারাজ ভক্তদের কাছে টাকা তুলে ভক্ত এবং সুপণ্ডিত সাহিত্যিকদের সাহায্যে পত্রিকাখানিকে রসসম্ভারে সমৃদ্ধ করে রক্ষা করলেন; অতঃপর স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী শুদ্ধানন্দ নিলেন 'উদ্বোধনে'র ভার। রাজা মহারাজ 'গুরু'-শীর্ষক একটি সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন তাতে সেই সময়ে। তারপর মাঝে মাঝে ঠাকুরের উপদেশগুলি প্রকাশ করতে লাগলেন। স্বামী সারদানন্দ নিয়মিত লিখতে লাগলেন ঠাকুর এবং স্বামীজীর আদর্শ প্রচার করে। স্বামীজীর রচনা, চিঠি ও বক্তৃতার অনুবাদ ক্রমে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' ও অন্যান্য অনেক বই উদ্বোধন কার্যালয়ের চেষ্টায় মুদ্রিত হল, বাংলা দেশের আবালবৃদ্ধবণিতাকে আকৃষ্ট করলে ঠাকুরের করুণা-ছায়ায় স্নিগ্ধ ধর্মজীবনের পথে।

ওদিকে কাশী অদ্বৈতাশ্রমের ভার নিয়ে স্বামী শিবানন্দ কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছেন স্বামীজীর দেহত্যাগের পর থেকেই। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি রাজা মহারাজ প্রথমে সেখানেই গেলেন; এক মাস সেখানে থেকে গৃহী ভক্তদের সহায়তায় টাকা তুলে আশ্রমের অর্থকষ্ট লাঘব করলেন। স্থানীয় যে সেবা প্রতিষ্ঠানটি স্বামীজীর সময়ে আরম্ভ হয়েছিল, রাজা মহারাজের পরামর্শে এবং প্রেরণায় সেটি এই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হল; জমি কিনে বাড়ী করে তিনি সেটিকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম' রূপে স্থায়ী ভিত্তিতে দাঁড় করবার ব্যবস্থা করলেন। কাশী থেকে তিনি গেলেন কনখলে। স্বামীজীর শিষ্য কল্যাণানন্দ সেখানে অসুস্থ সাধুদের জন্য তিনটি চালাঘর তুলে সেবার কাজ চালাচ্ছিলেন। কলকাতার এক ভক্তের অর্থসাহায্যে পনরো বিঘা জমি কিনে রাজা মহারাজ সেখানে পাকা বাড়ী তোলার আয়োজন করলেন। হরিদ্বার থেকে বৃন্দাবনে এসে তিনি তুরীয়ানন্দের সঙ্গে মিলিত হলেন আবার তপস্যার জন্য। স্বামীজীর বিরহ তাঁকে উন্মনা করে দিল, ভালো লাগছিল না আর কাজের ভিড়। অনেক দিন থেকেই মনটা চাইছিল একজন আদর্শ ধর্মসঙ্গী। অদৃশ্য, অব্যক্ত, অবর্ণনীয় মহাশক্তির দ্বারস্থ হলেন রাজা মহারাজ নূতন করে। অশেষগুণান্বিত, সুপণ্ডিত, সাধকপ্রবর তুরীয়ানন্দের সঙ্গ মঠের তরুণ সন্ন্যাসীদের ধর্মজীবন গঠনের সহায়ক হবে মনে করে মহারাজ তাঁকে একবার বেলুড়ে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীজীর মৃত্যুর পর শোকবিহ্বল তুরীয়ানন্দ তখন নির্জনে তপস্যায় মগ্ন থাকতে চান দেখে আর জোর করলেন না। আপন আপন সাধনায় ডুবে রইলেন দুজনে। কুসুম-

সরোবর পল্লীতে বনের মধ্যে একটি ভগ্ন দেবালয়ে কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন রাজা মহারাজ। রাত বারোটায় ঘুম থেকে উঠে ধ্যানে বসতেন। বৃন্দাবনে সাধনাকালে ঠাকুরের ভক্ত নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের ছেলে নীরদ তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েন; পরে তাঁর নাম হয় অম্বিকানন্দ। কলকাতা ফেরবার পথে মহারাজ এলাহাবাদে একদিন স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কাছে কাটিয়ে বিন্ধ্যাচলে ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সেনের বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। কথা ছিল সেখানে তিন রাত্রি থাকবার, কিন্তু যোগীন বাবুর আগ্রহাতিশয্যে কয়েক সপ্তাহ থাকা হল শেষ পর্যন্ত। দিবারাত্র দেবীর ভাবে বিভোর হ'য়ে কাটল সেখানে! গভীর রাত্রে কোনদিন নীরদকে নিয়ে দেবী মন্দিরে গিয়ে সাধনভজন করতেন। সুকণ্ঠ নীরদকে শ্যামাবিষয়ক গান গাইতে বলে সেই গান শুনে 'মা, মা' বলে কেঁদে আকুল হতেন কোন দিন; কোন দিন পুলককম্পাদি দেখা দিত, সমাধিমগ্ন হতেন একবারে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে। এইভাবে কিছুদিন অধ্যাত্মানুভূতির স্বাদ লাভ করে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৯০৪ সালের নবেম্বরে বেলুড়ে ফিরলেন। এতদিন স্বামী সারদানন্দ মঠের ও মিশনের তত্ত্বাবধান করছিলেন এবং প্রয়োজন মতো সমস্ত সংবাদ তাঁকে চিঠিতে জানিয়ে পরামর্শ নিচ্ছিলেন। এইবার আবার রাজা মহারাজকে স্বহস্তে সংঘতরণীর হাল ধরতে হ'ল। দিনের পর দিন বেড়ে চলল ভক্তের ভিড়, সংসার পরিত্যাগেচ্ছু যুবকদের ভিড়। ঠাকুরের ভাব ও বাণী দেশে দেশে প্রচারিত হতে লাগল। রাজা মহারাজ আচার্যপদে অধিষ্ঠিত থেকে শত শত যুবককে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে এবং ঠাকুরের অমৃতময়ী বাণী প্রচারের প্রচেষ্টাকে সুপরিচালিত করতে লাগলেন।

সতেরো

স্বামী সারদানন্দের সম্পাদনায় 'উদ্বোধন' তখন দাঁড়িয়ে গেছে, মঠ এবং সংঘের কাজও যন্ত্রের মতো সুনিয়মিতভাবে চলেছে। মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বাগ্মিতা এবং অনুপম চরিত্রমাধুর্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সুদূর কন্যাকুমারী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। চতুর্দিকে বিপুল কর্মচাঞ্চল্য; তার মধ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ঠাকুরের জন্মোৎসবের ক'দিন পরেই রাজা মহারাজ টাইফয়েড্ জ্বরে পড়লেন, অসুস্থ হওয়া মাত্র তাঁকে ক'লকাতায় বলরাম-গৃহে নিয়ে আসা হ'ল। রাজা মহারাজ নিজ আধ্যাত্মিক জীবন এতদিন লোকচক্ষুর অগোচরে রেখে চলেছিলেন অনেকখানি; এই অসুখের সময় অনেকেই তাঁর পরিচয় পেয়ে ধন্য হ'ল। তাঁর গুরুভাই এবং শিষ্যেরা এই সময় তাঁকে সর্বদাই আধ্যাত্মিকতার এক অত্যুচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত দেখতে পেতেন। কি যেন একটা অপার্থিব আবির্ভাব তাঁর দেহের অণুপরমাণুতে ব্যাপ্ত হয়ে তাঁকে জ্যোতির্ময় করে তুলেছিল।

একটু সুস্থ হতেই রাজা মহারাজ স্বামী বিরজানন্দের সঙ্গে হাওয়া বদলাতে গেলেন শিমুলতলায়। সেখান থেকে মঠে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই খবর গেলেন, ভাগলপুরে দারুণ প্লেগের প্রকোপ হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের সেবাকার্য আরম্ভ হ'ল তখনই সেখানে। স্বামী সদানন্দের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল, ক'লকাতায় প্লেগের সময়

তিনি সেবার কাজ করেছিলেন। এখন রাজা মহারাজ তাঁর নেতৃত্বে সেবকের দল পাঠিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসীদের প্রাণপণ সেবায় বহুজনের জীবন রক্ষা হ'ল। তাঁদের সাহস, সহিষ্ণুতা এবং যত্নে মুগ্ধ হ'ল দেশবাসী।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মহারাজ কনখল সেবাশ্রমের গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা পাঠিয়ে স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে দিয়ে সেখানকার বাড়ী তৈরি করালেন। টাকা দিলেন ক'লকাতার দু'জন ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী। ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা জায়গায় এই বছর শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। সাধুরা কে কোথায় যাবেন এই উপলক্ষ্যে রাজা মহারাজ তা' স্থির করে দিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ তাঁর নির্দেশে রেঙ্গুনে জনসভায় বক্তৃতা দিলেন, তারপর গেলেন বোম্বাই-এ। তাঁর বক্তৃতা শুনে বোম্বাই-র নেতৃবৃন্দ মুগ্ধ হলেন, বোম্বাই-এ মঠ স্থাপনের অনুরোধ এল তাঁদের পক্ষ থেকে।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি রাজা মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে পুরী গেলেন। বহু পূর্বাচার্যের স্মৃতিপূত এই নীলাচল; শঙ্কর, রামানুজ এবং শ্রীচৈতন্যের দিব্য বাণী এখান থেকে একদিন ভারতবর্ষ প্লাবিত করেছিল। রাজা মহারাজ এখানে খুব আনন্দে কাটালেন কিছুদিন। কখনও লীলাচঞ্চল শিশুর মতো আনন্দে মত্ত হতেন, কখনও ধ্যানগভীর সাধকরূপে আত্মানন্দে ডুবে থাকতেন, আবার কখনও জীবকল্যাণে উদ্বুদ্ধ গুরুরূপে শিষ্য এবং সমাগতদের অধিকারিভেদে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের উপদেশ দিতেন। নীলাচলে থাকতে শিবানন্দ এবং অখণ্ডানন্দ তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন, তারপর আমেরিকা-প্রত্যাগত অভেদানন্দ এবং মাদ্রাজমঠের অধ্যক্ষ

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও এসে পৌঁছুলেন। অনেকদিন পরে গুরুভাইরা একত্র হ'লেন পুণ্যক্ষেত্রে ; এক একজন এক এক দিক্‌পাল। শ্রীক্ষেত্রে সাধক এবং ভক্ত-সমাগমে আনন্দের হাট বসে গেল যেন। কত পাপীতাপী বুকভরা সান্ত্বনা নিয়ে ফিরে গেছল সে সময়ে, তার ইয়ত্তা নেই। ডিসেম্বর মাসে মিসেস্ সেভিয়ারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য রাজা মহারাজকে বেলুড়ে ফিরতে হ'ল, পথে কোঠার হ'য়ে গেলেন তিনি।

এই সময়ে ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং শ্রীহট্টে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়েছে, খবর এল। বেলুড়ের সাধু ও ব্রহ্মচারীদের পাঠালেন রাজা মহারাজ অবিলম্বে। চব্বিশপরগণার ডায়মণ্ডহারবারেও অন্নকষ্টের প্রতিকারের জন্য লোক পাঠান হ'ল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলেছিল এই সব জায়গায় সেবার কাজ। বৃন্দাবনে কাশী সেবাশ্রমের আদর্শে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভ হয় এই সময়। পরবৎসর সেটি শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের অন্তর্ভুক্ত সেবাশ্রমরূপে পরিগণিত হয়।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মহারাজ আবার পুরীতে আসেন। সেখান থেকে ভদ্রকে গেলেন তিনি। ভদ্রকে তখন কলেরা আরম্ভ হয়েছে। রাজা মহারাজ সকলকে স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্য উপদেশ দিয়ে সেখানে কিছুদিন থাকার পর কোঠার হয়ে মঠে ফিরলেন। সেবাশ্রমের নূতন বাড়ীর ভিত্তি স্থাপনের জন্য তিনি অতঃপর এপ্রিল মাসে কাশী যান। তাঁর অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার জন্য সর্বত্রই সংঘের কর্মীরা তাঁর উপদেশের জন্য উপস্থিত হ'তেন এবং তাঁর নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে পালন করতেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জলপ্লাবনে পুরী

জেলার সমূহ ক্ষতি হয়; মিশনের সেবাকার্যও আরম্ভ হয় সেখানে সঙ্গে সঙ্গে। এর কিছুদিন পরে পুরী হ'য়ে রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে রাজা মহারাজ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বার হলেন।

মাদ্রাজে থাকতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু ভক্ত আকৃষ্ট হন তাঁর প্রেম, ভক্তি এবং উদারতায়। ভক্তিমতী আমেরিকান মহিলা দেবমাতার বাড়ীতে বড়দিনের উৎসবে সদলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সে দিন বাইবেল পাঠের সময় বেদীর সামনে ভগবান যিশুখ্রীষ্ট প্রত্যক্ষ হয়েছিলেন তাঁর সামনে, কথা কয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। অব্রাহ্মণের বাড়ীতে পঙ্‌ক্তিভোজে বসেছেন রাজা মহারাজ, বাঙ্গালোরে অস্পৃশ্যদের পাড়ায় গেছেন এবং হরিজনদের ডেকে মহোৎসাহে কীর্তনভজন করেছেন। তাঁর তপঃপ্রভাবে উজ্জ্বল করে তুলেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষের মন, দাক্ষিণাত্যের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার মুমুক্ষকে শুনিয়েছেন, "নিশ্চলতার শিখরে আপনাকে বন্দী করে রেখো না, তপস্যার স্রোতে ভেসে যাও, অসীমলোকে পৌঁছোবার পথ—তপঃ, তপঃ, তপঃ।" ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষদের কাজ ও কথার প্রভাব সুদূর প্রসারী; সাধারণ মানুষের ভাষায় তাঁদের লীলার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরে দেবীদর্শন করে রাজা মহারাজ অতীন্দ্রিয়ভাবে বিহ্বল হ'য়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন; পরে বলেছিলেন, "যখন বিগ্রহের সামনে দাঁড়ালুম, তখন দেখলুম জগন্মাতার বিগ্রহ যেন জীবন্ত হ'য়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন; তাইতে সংজ্ঞাহারা হয়েছিলুম।" প্রায় একঘণ্টা কাল ভাবসমাধিতে মগ্ন ছিলেন সেদিন মহারাজ; শত শত দেবীদর্শনার্থী ধন্য হয়েছিল তাঁকে দেখে।

বাঙ্গালোরে রামনাম-সংকীর্তন শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন মহারাজ। বাংলাদেশে রামনাম কীর্তন এবং মহাবীরের পূজা প্রচলন করবার জন্ম স্বামীজীর একান্ত আগ্রহ ছিল; এবার সেই কথা স্মরণ করে তিনি উদ্যোগী হলেন। মহাবীর উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই ভগবানের ভক্ত সেবকরূপে পূজিত; কেবল বাংলাদেশেই তাঁর অনাদর। রাজা মহারাজ নূতন করে বাঙ্গালীর সামনে ধরলেন মহাবীরের আত্মনিবেদনের আদর্শ, কবিগুরু বাল্মীকির সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে প্রণাম-মন্ত্র উচ্চারণ করলেন সেই মূর্খ অনার্যভক্তের উদ্দেশ্যে—

"সীতারামগুণগ্রামপুণ্যারণ্যবিহারিণৌ
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বর-কপীশ্বরৌ।"

মাদ্রাজ মঠে থাকতে রাজা মহারাজ ক্রমে ক্রমে দাক্ষিণাত্যের নানাতীর্থ দর্শন করেন, সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে তিনি সোনার, রূপার এবং তামার বেলপাতা দিয়ে শিবপূজা করেন; শ্রীশ্রীমা সেই সংবাদ পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলেন এবং আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন তাঁকে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে মাদ্রাজ থেকে পুরীতে ফিরলেন রাজা মহারাজ; রামকৃষ্ণানন্দের প্রশংসা তাঁর মুখে ধরে না। অক্টোবর মাসে পুরী থেকে বেলুড়ে এলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বলরাম মন্দিরে স্বামী শিবানন্দ এবং অখণ্ডানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজা মহারাজ মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যধারা বিধিবদ্ধ করবার জন্ম একটা খসড়া তৈরি করেছিলেন; স্বামী সারদানন্দও মাঝে মাঝে যোগ দিতেন আলোচনায়। মহারাজ দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরলে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে রামকৃষ্ণ মিশন রেজিষ্ট্রি করা হ'ল আইন অনুসারে।

রাজা মহারাজ

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাজা মহারাজ তখন পুরীতে। তিনি তাঁকে চিকিৎসার জন্ত ক'লকাতায় আসতে লিখলেন; নিজে খুরদা স্টেশনে গিয়ে রাত এগারোটার সময় তাঁর সঙ্গে ট্রেনে উঠে দেখা করলেন। বললেন, "শশী, এসব কি? অসুখ-বিসুখ সব ঝেড়ে ফেলে দাও।" কথাটা বললেন তাঁর মনের জোর বাড়াবার জন্ত, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন সময় ফুরিয়ে আসছে। এই শেষ দেখা। রামকৃষ্ণানন্দ ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললেন, "তুমি আশীর্বাদ করলেই হবে।" নিয়তি হাসলেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ক'লকাতায় উদ্বোধন কার্যালয়ে রামকৃষ্ণানন্দ লীন হলেন মহা সমাধিতে। রাজা মহারাজ তখনও পুরীতে। খবর পেয়ে বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "একটা দিক্‌পাল চলে গেল। দক্ষিণদিকটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল।"

আঠারো

ঠাকুর বলতেন, "জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীব সেবা।" স্বামীজী সেই বাণীটিকেই কবিতায় রূপ দিলেন,

"বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

তিনি বুঝেছিলেন, নিস্পৃহ, উদ্যমহীন ভারতবাসীকে তমোগুণনাশের জন্য আগে রজোগুণের আশ্রয় নিতে হবে, তারপর আসবে সত্ত্বগুণের সাধনা। এই রজোগুণের সাধনার পথে কর্ম যাতে বন্ধন হ'য়ে না দাঁড়ায়, সেজন্য কর্মীর প্রয়োজন উপাসনার এবং আত্মচিন্তার। রাজা মহারাজ ব'লতেন, "কর্ম না করে জ্ঞানলাভ হয় না। যারা কর্ম ছেড়ে শুধু ধ্যান জপ নিয়ে থাকে, তাদের ও ঝুপড়ি বাঁধতে আর ভিক্ষে করতেই সময় কেটে যায়।"

ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ মনে করে কাজ করে গেলে বন্ধন আসবে না, এই ছিল তাঁর উপদেশ, বলতেন, "ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখলে মনের একটা শক্তি জন্মে। বারো আনা মন ভগবানের দিকে রেখে চার আনায় জগতের কাজ করলে ভেসে যায়।" রামকৃষ্ণ সংঘের সেবার কাজ পাশ্চাত্ত্য আদর্শের অনুকম্পাপ্রসূত নয়; এ হ'ল জীবন্ত ভগবানের পূজা। আর্ত, দরিদ্র, রুগ্ন, মূঢ় মানবের বিগ্রহে বিরাজিত নারায়ণকে প্রেম দিয়ে, ভক্তি দিয়ে,

সেবা ক'রে সেবকই কৃতার্থ হন, সর্বব্যাপী ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি লাভ করে ধন্য হন। রাজা মহারাজ নিষ্কাম কর্মে সন্ন্যাসীদের উদ্বুদ্ধ করার সময় এই কথাটি বারবার তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতেন। দেশাত্মবোধ জেগেছে তখন দেশে, পরাধীনতার গ্লানি জ্বালা ধরিয়েছে বহু মানবের মনে। দলে দলে যুবক পাশ্চাত্ত্য আদর্শে স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের পথে নেমেছে, রাজরোষ এবং নির্যাতন অগ্রাহ্য করে। এদের মধ্যে অনেককে রাজা মহারাজ মঠে আশ্রয় দিয়ে স্বদেশের গঠনমূলক কাজে লাগিয়েছেন; জন-কল্যাণের পথে চালিত করে তাদের পারমার্থিক অগ্রগতির সহায়তা করেছেন। তিনি বলতেন, "অনেকে বলে দেশের ও দশের কাজ করবে। আমার মনে হয়, এ ভাব ইংরেজী শিক্ষার বদহজম। নিজের চরিত্র তৈরি না হ'লে তার দ্বারা অপরের কল্যাণ কখনও সম্ভব হয় না। যারা তাঁকে ঠিক ঠিক আশ্রয় করেছে, তাদের কখনও বেচাল হয় না। তাদের কাজকর্ম, কথাবার্তা, চালচলন দেশের মঙ্গলের কারণ হয়। একদিকে এই জীবন্ত মহান আদর্শ, আর একদিকে রাজা মহারাজের অগাধ বিশ্বাস, মধুর উপদেশ এবং স্নেহময় সান্নিধ্য মঠের কর্মীদের অহোরাত্র অনুপ্রাণিত করত। তাঁর প্রিয়কার্য সাধন করতে, ঠাকুরের এবং স্বামীজীর প্রিয় কার্য সাধন করতে, শতশত যুবক হাসতে হাসতে জীবন দিতে পারত। রাজা মহারাজও যাকে যে কাজের দায়িত্ব দিতেন, তাকে বিশ্বাস করে পূর্ণস্বাধীনতা দিতেন সে কাজে; তার ছোটোখাটো দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করতেন। কাজের সফলতার জন্য চেষ্টার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবার জন্য কর্মীরা চেষ্টা

করতেন প্রাণপণে। সংঘের প্রাণশক্তি নিহিত ছিল এই কর্ম-কৌশলের মধ্যে; তাই দিন দিন তার কর্মক্ষেত্র বেড়েই চ'লল।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রাজা মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও অন্যান্য সাধু ভক্তদের নিয়ে কনখল সেবাশ্রমে গেলেন। কনখল ও হরিদ্বারে দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের বহু মঠ এবং আখড়া আছে। রাজা মহারাজ এবং তাঁর সঙ্গীদের ভক্তি, পাণ্ডিত্য এবং চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে এই সমস্ত মঠের মোহান্ত বা অধ্যক্ষেরা তাঁদের সংবর্ধনা জানালেন এবং আত্মীয়বোধে প্রীতির সম্বন্ধে বদ্ধ হলেন। এতদিন তাঁরা কনখলের বাঙালী সন্ন্যাসীদের কেবল চিকিৎসক বলেই জানতেন; এখন তাঁদের গুরুকে দেখে, তাঁর তপঃপ্রভাবে মুগ্ধ হয়ে, তাঁদের সেই ভুল ভেঙে গেল; র কোন্ উচ্চ ভূমিতে উঠলে একসঙ্গে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের এরূপ আদর্শ সমন্বয় সম্ভব, তা' বুঝতে পেরে তাঁরা শ্রদ্ধা জানালেন এই সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে।

শরতের শুভ্র আলোয় মা আনন্দময়ীর আগমনবার্তা ছড়িয়ে পড়ে বাংলার ঘরে ঘরে; প্রবাসে গিয়েও মহারাজ ভুলতে পারলেন না মাতৃপূজার কথা। হিমালয়ের পাদদেশে, গিরি প্রকৃতির বিপুল সমারোহের মধ্যে, কলনাদিনী গঙ্গার তীরে, গিরিরাজ-তনয়ার জন্য ব্যাকুল হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসসন্তানের মন। সতীর দেহত্যাগের বহু যুগ পরে জগজ্জননী আবার দক্ষালয় কনখলে আবির্ভূতা হলেন দশভুজা সিংহবাহিনীরূপে। ক'লকাতা থেকে প্রতিমা আনিয়ে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা হ'ল। শত শত সাধু সন্ন্যাসী ভক্ত প্রসাদ পেয়ে ধন্য হ'ল। সেদিনকার পূজামণ্ডপে সন্ন্যাসী এবং ভক্তবৃন্দ

পরিবেষ্টিত, প্রেমপারাবার ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মতেজ-সমুদ্ভাসিতমূর্তি, চণ্ডী-পাঠ-নিরত স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং তপস্যাদীপ্ত, সৌম্যকান্তি শিবানন্দকে যাঁরা মাতৃ বিগ্রহের পদপ্রান্তে সেই আনন্দ সম্মেলনে দেখেছেন, তাঁরা জীবনে সে দৃশ্য ভুলতে পারবেন না।

কনখলে দুর্গাপূজোর পর রাজা মহারাজ গেলেন কাশীতে। কাশী ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় জায়গা। গিয়েই তিনি সাধু ব্রহ্মচারীদের বললেন, "দেখ, উঠে পড়ে লাগ। এমন স্থান যে আপনি ধ্যান জমে যায়। সর্বদা হর হর, ব্যোম ব্যোম শব্দ হচ্ছে। কাশীর আবহাওয়াই অন্তরকম।" এই সময়ে শ্রীশ্রীমাও কাশীতে এসে আশ্রমের কাছে লক্ষ্মীনিবাসে ছিলেন। তাঁর আগমনে চারদিকের আবহাওয়া যেন পবিত্র হয়ে উঠেছিল। রাজা মহারাজ প্রতিদিন বেড়াতে বেরিয়ে তাঁর বাসায় যেতেন। সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা বৃদ্ধা গোলাপ-মার সঙ্গে ছেলেমানুষের মতো হাসি তামাসা করতেন; শ্রীশ্রীমা আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসতেন তাঁর আদুরে ছেলের কাণ্ড দেখে। একদিন গোলাপ-মা দোতলা থেকে বললেন, "রাখাল, মা জিজ্ঞাসা করছেন, সকল সাধকদের আগে শক্তি পূজো করতে হয় কেন?" রাজা মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি।"

সে সময়ে সুগায়ক অঘোর বাবু কাশীতে ছিলেন। তাঁর মুখে ভজন শুনে খুব আনন্দ পেতেন মহারাজ। ঠাকুরের ভক্ত মাস্টার মশাইও ছিলেন তখন কাশীতে। তিনি এবং তাঁর মতাবলম্বীরা বলতেন, সেবাশ্রম প্রভৃতি স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের সৃষ্টি, আসলে ভগবানের সেবা ছেড়ে আর্ত মানুষের সেবা করা ঠাকুরের মত

ছিল না। কিন্তু শ্রীশ্রীমা যখন কাশী সেবাশ্রম দেখে বললেন, "দেখছি ঠাকুর এখানে প্রত্যক্ষ রয়েছেন। এখানে মা লক্ষ্মী বাঁধা, তাই এই সব কাজ হচ্ছে। এই কাজ তাঁর কাজ," তখন রহস্যপ্রিয় রাজা মহারাজ সেই কথা অল্পবয়স্ক ব্রহ্মচারীদের দিয়ে শুনালেন মাস্টার মশাইকে। মাস্টার মশায়ের সংশয় ঘুচে থাকবে সেদিন থেকে। শ্রীশ্রীমা সেবাশ্রম দেখতে এসে একখানি দশ টাকার নোট দিয়েছিলেন; সেখানি আজও সযত্নে রাখা আছে সেখানে তাঁর পুণ্য-স্মৃতির স্মারকরূপে। কাশীতে ছ'মাস কাটল এমনিভাবে; তারপর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বেলুড় মঠে ফিরে এলেন রাজা মহারাজ। স্বামী প্রেমানন্দ তখন মঠের দেখাশোনা করেন। মধুরস্বভাব, সাধকপ্রকৃতির নিয়মনিষ্ঠ মানুষটি; কিন্তু একা পেরে উঠছেন না তিনি। বেলুড় তখন ম্যালেরিয়ার ডিপো, তার ওপর বর্ষা পড়লেই নানারকমের পেটের রোগে শয্যা নেয় সবাই। বৎসরের মধ্যে প্রায় ছ'মাস সন্ন্যাসীরা রোগের জ্বালায় অস্থির, তখন সাধন-ভজন সব শিকেয় ওঠে। নিয়মানুবর্তিতা আর থাকছে না মঠে। ব্যাপার দেখে একদিন রাজা মহারাজ প্রেমানন্দজীকে বললেন, "বাবুরাম-দা, ছেলেদের স্বাস্থ্য তো ভালো দেখছি না, আর তাদের সাধন-ভজনেই বা আঁট কই।" প্রেমানন্দজী বললেন, "ওদের যাতে কল্যাণ হয়, সাধন-ভজনে রুচি হয়, তুমি দয়া করে তাই কর, মহারাজ।"

রাজা মহারাজ প্রথমে গঙ্গার ওপার থেকে নৌকা বোঝাই করে কলের জল আনবার ব্যবস্থা করলেন। মঠের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নূতন সাধু-ব্রহ্মচারীদের ঘড়ি ধরে কাজ শেখালেন। নিয়ম বেঁধে

দিলেন—খাওয়ার, শোয়ার, ঘুমবার, পড়ার, এমনকি ধ্যান-ধারণায় পর্যন্ত। রাজা মহারাজ বললেন, "অনিয়মিত জীবন হলে কোন কাজে সফল হওয়া যায় না। উঠে পড়ে লাগ, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন। মরতে তো হবেই, দু'দিন আগে আর পরে। নদীর স্রোতের মত জীবন কেটে যাচ্ছে; যে দিনটা গেল, সে আর ফিরবে না। সময়ের সদ্ব্যবহার কর, শেষে 'হায় হায়' করলে কোন ফল হবে না।" নিজের জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'ল আবার তরুণ সাধকের দল, সাধনপথে অগ্রসর হ'ল তাঁর সাহচর্যে এবং উপদেশ ও প্রেরণা লাভ করে।

উনিশ

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে মহারাজ আবার কাশী গেলেন এবং ১৯১৫-র নবেম্বর পর্যন্ত সেখানেই কাটালেন। সেইবারে রামনাম-সংকীর্তনের বই কিছু ছেপে এল ক'লকাতা থেকে। আশ্রমের কর্মীরা মহারাজের উৎসাহে কীর্তনের মহড়া দিতে লাগলেন। একবার একাদশীর দিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরাম, জানকী, মহাবীর এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে নৈবেদ্য উৎসর্গ ক'রে পূজারতি করা হ'ল। আরতি-শেষে সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বসেছেন, স্তবপাঠ আরম্ভ হয়েছে, এমন সময় মহারাজ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে আসন দিতে বললেন। একটি আসন পেতে একখানি পুস্তিকা রাখা হল তার ওপর। পরে মহারাজ বলেছিলেন, মহাবীর স্বয়ং এসেছিলেন কীর্তন শুনতে, তাই তিনি আসন দিতে বলেছিলেন। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তির জন্য কত যে দেবদেবী এবং অপার্থিব জীবের দর্শন পেতেন তিনি যখন-তখন !

সেবার মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হল কাশীতে। মহারাজের গাছপালার সখ ছিল ছোটবেলা থেকে। কাশী সেবাশ্রমেও তিনি দেশবিদেশ হইতে গাছ এনে লাগিয়েছিলেন। কাশী থেকে তিনি অযোধ্যা গেলেন ঝুলনযাত্রা দেখতে। সেখানে একদিন শ্রীবিগ্রহের সামনে এক নটের সুমধুর নৃত্যগীতে আত্মহারা হ'য়ে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে

সমাধিমগ্ন অবস্থায় ছিলেন কয়েক ঘণ্টা। অযোধ্যায় থাকতে প্রায়ই সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিয়ে কালীকীর্তনে বা রামনামকীর্তনে মাত্‌তেন মহারাজ। একদিন মহাবীর-মন্দিরের উঠানে খুব জমেছিল রামনাম। উঠানে তিল ধরবার জায়গা ছিল না, হাজার হাজার লোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে শুনেছিল নামগান, অনেকে কাছাকাছি বাড়ীর ছাদে এবং গাছে উঠেছিল তাঁদের কীর্তন দেখবার জন্য। কীর্তনশেষে মন্দিরের মোহান্ত মহারাজকে প্রণাম করে বলেছিলেন, "এমন আনন্দ আমি জীবনে পাই নি।" ভজনের সময় মহারাজ প্রায়ই ভাববিভোর হয়ে বসে থাকতেন, তাঁর পার্শ্ববর্তী সকলেরই অন্তরে নিজের আনন্দ এবং ভক্তি যেন নিঃশব্দে ছড়িয়ে দিতেন। তাঁর উপস্থিতিতেই যেন একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি হত কীর্তনের সময়।

কাশীতে থাকতে দুর্গাবাড়ী, সঙ্কটমোচন, অন্নপূর্ণার মন্দির প্রভৃতি নানাস্থানে তাঁর প্রেরণায় ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীরা কীর্তন করে হাজার হাজার মানুষের মনে ভক্তিপ্রবাহ বইয়েছেন। তিনি আশ্রমের সাধুদের সর্বদা কাজের সঙ্গে তপস্যা করে যেতে উৎসাহ দিতেন। বলতেন, "কি করছ তোমরা? সংসার ত্যাগ করলেই কি সব হয়ে গেল? তাঁকে জানবার জন্য চাই তপস্যা, তপস্যা ছাড়া কি কিছু হয়? ··· কেউ কি না খেটে কিছু পেয়েছে? বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, এঁদেরও কত তপস্যা করতে হয়েছে। ডুবে যাও, এই জন্মেই খেটেখুটে মনটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে, যেন আর না জন্ম হয়।"

কাশী সেবাশ্রমের পশ্চিম দিকে প্রায় পঁচিশ বিঘা জমি সরকারের

সাহায্যে আশ্রমের বিস্তারের জন্য নেওয়া হয়। সেদিকটায় ছিল নেবুবাগান আর বাঁশবন। মহারাজ নেবুগাছের তলায় তলায় একজন সেবককে দিয়ে হাঁড়ি পাতিয়ে দিলেন—পাখীদের স্নানের ও পানের জন্য জল রাখা হত তাতে; আর আশ্রমের ভাঁড়ার থেকে চালগম ঝাড়াই করে যে খুদকুঁড়ো ফেলা যেত, সেগুলি সেখানে ছড়িয়ে দিতে বলতেন পাখীদের খাওয়ার জন্য। বলতেন, "যার যা প্রাপ্য, তাকে তা দিতে হয়।"

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ভারী অসুখের পর থেকেই মহারাজ একদিন অন্তর গরম জলে স্নান করতেন। একদিন সকালে সুগায়ক অঘোর বাবু অদ্বৈতাশ্রমে, 'আনন্দবন গিরিজাপত-নগরী' গানটি শুনিতে গেলেন। ব্রহ্মচারী সেবককে স্নানের জল ঠিক আছে কি না জিজ্ঞাসা করে মহারাজ তার আগে আগে অদ্বৈতাশ্রম থেকে সেবাশ্রমে এলেন। সেবকটি কি একটা আনতে মহারাজের শয়ন ঘরে ঢুকেছেন; ফিরে এসে দেখেন, মহারাজ নিখোজ। খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল, নতুন জমিতে যাবার জন্য যে দরজাটি বসানো হয়েছিল, তার খিল খোলা; দরজা খুলতে নজরে পড়ল মহারাজ কাপড়-জুতা ফেলে দিয়ে নেবুবাগানে আপন মনে একা একা হাততালি দিয়ে নাচছেন আর গাইছেন, "আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব।" সে স্বর্গীয় দৃশ্য যে দেখে নি, তাকে বোঝান যাবে না। সেবাশ্রমের যে খোলা জায়গাটিতে সভাদি হত, সেখানে একটি বেলগাছ থাকায় শামিয়ানা টাঙানোর অসুবিধা হত। অচলানন্দজী সেটি কেটে ফেলবার প্রস্তাব করলে মহারাজ নিষেধ করেন। বলেছিলেন, "আরে না, না, ওটি কেটো না। ওতে একটি spirit (সূক্ষ্মদেহী) বাস

করে ; তার আশ্রয়টি নষ্ট কোরো না। আহা, কারো আশ্রয় কি নষ্ট করতে আছে ?" বেলগাছ কাটা হল না। মহারাজজীর কথা শুনে শুভানন্দ (চারু বাবু) বলেছিলেন, "যিনি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি সর্বভূতের আশ্রয়দাতা।" 'সর্বভূতহিতে রতাঃ' কথাটি স্বামীজী এবং মহারাজ যেমন আচরণে দেখিয়েছিলেন, তেমন ক'জন পারে ? দেহহীন প্রেতাত্মাও তাঁর দয়া লাভ করেছিল ; অভয় পেয়েছিল তাঁর কাছে। এই সূক্ষ্মদেহীর বিষয় পরে আরও অনেক কথা ১৯১৪ সালে বলেছিলেন মহারাজ।

অযোধ্যা থেকে কাশীতে ফিরে মহারাজ জমিয়ে বসেছিলেন ; সেখান থেকে আর নড়বার ইচ্ছা ছিল না তাঁর। অন্তর্যামী তিনি, এক সেবকের মনোভাব বুঝে নবেম্বর মাসে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেন তাঁকে ; তারপর ডিসেম্বরে স্বামী প্রেমানন্দের একান্ত অনুরোধে তিনি প্রয়াগ ঘুরে কাশী থেকে বেলুড়ে ফেরেন। কাশীতে তিনি আড়াই বছর বাস করেছিলেন সেবার।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকটি অলৌকিক শক্তির পরিচয় ভক্তেরা অনেকেই পেয়েছেন। ইচ্ছামাত্র অপরের অন্তরে ধর্ম্মভাব জাগিয়ে দিতে পারতেন তিনি ; জিবে, বুকে বা ব্রহ্মতালুতে কিছু লিখে দিয়ে ইষ্টানুভূতি করিয়ে দিয়েছেন অনেককে। রাজা মহারাজের মধ্যেও এইরকম ঐশীশক্তির বিকাশ অনেক সময় প্রত্যক্ষ করেছেন ভক্তেরা। একটি উদাহরণ দেওয়া গেল এখানে। একবার রাজা মহারাজ বেলুড় মঠে থাকার সময় ঘটনাটি ঘটে। এক অবিশ্বাসী তরুণ যুবক তখন আই-এ পড়ে, সমবয়সীদের কাছে প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে। একদিন মঠের সাধুদের সঙ্গে তর্ক করবার জন্যই

সে বেলুড় মঠে গেল। সেখানে গিয়ে তাঁর এক সহপাঠীর দাদার সঙ্গে দেখা। কিছু কথা-কাটাকাটির পর তিনি তাকে নিয়ে গেলেন বাবুরাম মহারাজের কাছে। বললেন, "ইনি বাবুরাম মহারাজ, প্রণাম করো।" তরুণ যুবা প্রথম দর্শনে তাঁকে প্রণাম তো করলই না, উপরন্তু বললে, "এঁর ব্রাহ্মণশরীর কি না জানি না। আমি ব্রাহ্মণ, না জেনে প্রণাম করব কেন?" বাবুরাম মহারাজ তৎক্ষণাৎ উঠে বললেন, "বেশ, বেশ। চল নীচে একটু গান শুনবে।" বলেই যুবকের হাত ধরে তাকে সাধারণের বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে উপস্থিত সাধু-ব্রহ্মচারীদের বললেন, "তোমরা একটু কীর্তন কর।" অল্পক্ষণের মধ্যেই কীর্তন আরম্ভ হ'ল। হঠাৎ ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে তার মাথায় চুমো খেলেন বাবুরাম মহারাজ। সঙ্গে সঙ্গে তার কেমন যেন হয়ে গেল, এক অদ্ভুত তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল যেন তার দেহ-মনে। ব্যাকুলভাবে কেঁদে উঠল সে। কীর্তন চলছে, কিন্তু কান্না আর থামে না তার। তাই দেখে বাবুরাম মহারাজ তাকে আবার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন ঠাকুরঘরের দিকে। সিঁড়ির কাছে যেতেই দেখেন, উপর থেকে নেমে আসছেন মহারাজ। তখনও যুবকের হাত ধরে আছেন বাবুরাম মহারাজ। তাই দেখে মহারাজ বললেন, "বাবুরাম-দা, ছেলেটার মাথাটা খেলে?" বাবুরাম মহারাজ বললেন, "মহারাজ, তুমি একে আশীর্বাদ কর।" ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে মহারাজ বললেন, "পারবি?" সে বললে, "আপনি কৃপা করলে নিশ্চয় পারব।" মহারাজ বললেন, "ঠাকুরের কৃপা তো আছেই; তোর ভাবনা কি?" এই বলে তার ব্রহ্মতালুতে চুলের গোড়ায় ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে কি যেন লিখে দিলেন।

উদ্ধত যুবক তৎক্ষণাৎ নত হ'য়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিলে। মহারাজ আর কোন কথা না বলে উপরে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

যুবকটি সহসা অনুভব করলে, এই অমিততেজা মহাপুরুষের দয়ায় তার জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে গেছে।



কুড়ি

কিছুদিন মঠে থেকে সাধুদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা এবং নিয়মানু-বর্তিতার ভিত্তিমূল দৃঢ় ক'রে ঢাকায় গেলেন মহারাজ। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের মঠপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন হয়েছিল; পূর্ববঙ্গের নগরে নগরে বহু ভক্ত নরনারী উৎসুক হয়েছিল তাঁকে দেখবার ও তাঁর বাণী শোনবার জন্য। স্বামী প্রেমানন্দ এবং আর কয়েকজন সন্ন্যাসী এবং ভক্তের সঙ্গে তিনি প্রথমে কামাখ্যায় গেলেন। সেখানে প্রতিদিন দেবীদর্শন করতেন, এবং যে ক'দিন ছিলেন অধিকাংশ সময় অলৌকিকভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। একদিন তাঁর ভাবসমাধির সময় স্বামী প্রেমানন্দজী সঙ্গীদের সকলকে ডেকে দেখিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে যখন ভক্তেরা মহারাজকে ঘিরেছে এবং সুকণ্ঠ নীরদ মহারাজ হারমোনিয়াম বাজিয়ে মায়ের নাম কীর্তন করছেন, এমন সময় একদল কুমারী মেয়ে এসে উপস্থিত। তাদের মধ্যে একটি সুন্দরী মেয়ে নীরদ মহারাজের কাছে কাপড় চাইলে। রাজা মহারাজ তখনই তাকে একখানি দশহাতী রেশমী শাড়ী দান করেন এসেন্সে সুবাসিত ক'রে। ছোট মেয়েটি এমন গুছিয়ে সেই কাপড় পরলে যে সকলে দেখে অবাক। মহারাজ তিন দিন ছিলেন কামাখ্যায়। কুমারীর দল তাঁকে ঘিরে থাকত প্রায়ই। কুমারীপূজো এবং মার পূজো তিনি নিয়মিত

করাতেন, কিন্তু ঐ দিন থেকে সেই সুশ্রী মেয়েটিকে আর দেখা যায় নি। নীরদ মহারাজ প্রভৃতির বিশ্বাস, সে ছিল মায়েরই ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি।

কামাখ্যা থেকে সদলে ময়মনসিংহে গেলেন রাজা মহারাজ। সেখানে বহু ভক্ত ধন্য হলেন তাঁর সঙ্গ পেয়ে, তাঁর এবং স্বামী প্রেমানন্দের আশীর্বাদ লাভ করে। একদিন বিকেলে স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে নদীতীরে বেড়াতে বেরিয়ে মহারাজ ভাবস্থ হন। প্রেমানন্দ তখনই যুবক সঙ্গীদের ডেকে বললেন তাঁকে প্রণাম করতে, আর মহারাজকে বললেন ছেলেদের আশীর্বাদ করতে। মহারাজ আশীর্বাদ করে বললেন, "ছেলেদের অনেকে দেবতা হ'য়ে যাবে।" সেখানে মাঠে এবং নদীতীরে বেড়াতে বেড়াতে মহারাজ বলতেন, "এখানে যেন অনন্তে মন লীন হ'য়ে যাচ্ছে।" অতঃপর ক'দিন পরমানন্দে কাটিয়ে ঢাকায় গেলেন তিনি। সেখানকার মঠকে কেন্দ্র করে কাছাকাছি অনেক জায়গাতেই ঘুরলেন। কাশিমপুরের জমিদার পুত্রশোকে খুব কাতর হয়েছিলেন; মহারাজের দয়ায় তিনি অনেকটা সান্ত্বনা পান। গেণ্ডারিয়ায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর তপস্যাপূত আশ্রম, দেওভোগে সাধু নাগ মহাশয়ের পল্লীগৃহ দেখে খুব আনন্দ পেলেন মহারাজ। নারায়ণগঞ্জ থেকে দেওভোগ পায়ে হেঁটে গিছলেন মহারাজ সদলে কীর্তন করতে করতে; ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বহু ভক্ত তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন সেদিন। প্রেমানন্দ কীর্তনের সময় ধূলায় গড়াগড়ি দিয়েছিলেন নাগ মহাশয়ের বাড়ীর উঠানে; রাজা মহারাজ নাচতে নাচতে সমাধিমগ্ন হয়ে গিছলেন। নারায়ণগঞ্জে এবং ঢাকায় বহু ভক্তকে সাধনপথের নির্দেশ দিয়ে রাজা মহারাজ সদলে বেলুড়ে ফিরলেন (১৯১৬)। জুলাই মাস পর্যন্ত মঠেই

রইলেন সেবায়। মহারাজের মন এখন দুদিক রেখে চলেছে—নিত্য থেকে লীলায়, আবার লীলা থেকে নিত্যে। কখনও ধ্যানগম্ভীর অপূর্ব তেজোময় মূর্তি—ভক্তেরা দূর থেকে প্রণাম করে ফিরে আসে; কখনও বালস্বভাব উৎফুল্ল রূপ—নেচে গেয়ে, নাচিয়ে গাইয়ে, হাসি তামাসা করে দীনতমকে আপনার জন করে নিচ্ছেন। ভক্ত সুগায়কের মুখে ভজন কীর্তন শুনলে মেতে যাওয়া ছিল ছিল তাঁর স্বভাব; বেশী ভাব এলেই সমাধিতে মগ্ন হয়ে যেতেন স্থান কাল ভুলে। পুরাতন সঙ্গীদের মুখে শোনা যায়, তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের খুব মিল ছিল—চালচলনে হাবভাবে। অনেক সময় তাঁকে পিছন থেকে দেখলে নাকি ঠিক্ ঠাকুর বলে ভ্রম হত। তাছাড়া, তাঁর মতো এমন ঘন ঘন সমাধিমগ্ন হতে আর কাউকে দেখা যায় নি ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে। গুরুভাইরা বলতেন, "হবে না কেন? বাপকা বেটা।"

বেলুড়ের দোতলার বারাণ্ডায় একদিন কীর্তন হচ্ছে; মহারাজ চেয়ারে বসে শুনছেন। 'ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে' গানটি হচ্ছিল। 'কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে' শুনেই সমাধিমগ্ন হলেন মহারাজ। স্বামী প্রেমানন্দ তাঁর সেই অবস্থা দেখে ভক্তিভরে এক অঞ্জলি ফুল দিয়ে প্রণাম করলেন তাঁকে। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা উন্মত্তের মতো কীর্তন গেয়ে চললেন; সকলেই যেন কি এক দিব্য অনুভূতিতে বিভোর!

মহারাজ মঠে থাকতে নিয়ম করেছিলেন, ব্রহ্মচারী এবং সাধুরা ভোরে ঘরি ধরে উঠবে চারটের সময়; সাড়ে ছটা পর্যন্ত জপধ্যান করবে, তারপর সমবেত ভজন ও স্তোত্রপাঠ হবে। অনেক নিগূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্বের উপদেশ দিতেন তিনি এই সময়ে; অভিনব শক্তিসঞ্চার করতেন মুমুক্ষুদের দেহ-মনে। ভক্তদের দীক্ষা দিতে বসেও তিনি

অনেক সময় ভাববিহ্বল হয়ে পড়তেন। মন্ত্র বলতে বলতে মধ্যপথে জিব আড়ষ্ট হয়ে যেত তাঁর, চমকে উঠতেন থেকে থেকে। কোন পূর্ণাভিষিক্ত শিষ্যকে মন্ত্রোচ্চারণ করে তাঁকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হত সে সময়ে। দীক্ষাদাতা এবং দীক্ষার্থী একই সঙ্গে ভাব-তন্ময় অবস্থায় কাঁদছেন দিব্যানুভূতিতে বিভোর হয়ে! এ স্বর্গীয় দৃশ্য যে না দেখেছে, তাকে এর মাধুর্য বোঝানো সম্ভব নয়।

প্রথম দিকে সহজে কাউকে দীক্ষা দিতেন না মহারাজ। কেশব বাবুর বহু ভক্ত যখন তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, তখন ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "যাকে তাকে দলে নিয়েছিলে কেন? বেছে বেছে লোক নিতে পারো নি?" এই সাবধান-বাণী মনে ছিল মহারাজের। অনেক সময় দীক্ষা দেবার পূর্বে দু-তিন বছর পরীক্ষা করতেন ভক্তকে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ মিনার্ভায় রামানুজ নাটকের অভিনয় দেখলেন। মহাপুরুষ আচণ্ডালে নাম বিলুচ্ছেন, সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তাঁর মহত্ত্ব অনুভব করলেন তিনি। তাঁর মত বদলাল সেই সময় থেকে। দলে দলে ভক্তেরা দীক্ষা নিতে লাগল। রাজা মহারাজ বললেন, "যে আসবে, তাকেই তাঁর নাম দিয়ে যাব। এতে মঙ্গল হবেই।" তবে যে পর্যন্ত তিনি নিজে দীক্ষার্থীর ইষ্টমূর্তি দর্শন না করতেন, সে পর্যন্ত তাঁকে দীক্ষা দিতে চাইতেন না। দীক্ষা দিতে বসেও উঠে এসেছেন। কতবার বলেছেন, "তোমার গুরু অন্যত্র আছেন।" আবার একবার একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের বালবিধবা ঠাকুরের কাছে স্বপ্নাদেশ পেয়ে এসেছেন শুনে তাঁকে সেই মুহূর্তে সেইখানে বসেই দীক্ষা দিয়েছেন। ঠাকুরের কৃপায় যোগ্যা ছিলেন তিনি, পরে ভদ্রমহিলা সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন।

অক্‌স্‌ফোর্ডের এক ইংরেজ অধ্যাপক-দুহিতা মহারাজকে দর্শন এবং স্পর্শ করে অপার্থিব আনন্দ পেয়েছিলেন সেবার। তিনি দেবমাতাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "যা ভেবেছিলুম, তার চেয়ে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার। মাত্র পাঁচ মিনিটের দেখা; তাঁর দুটি হাতের মধ্যে আমার হাতটি নিয়ে তিনি এমন উৎসাহজনক, আশ্চর্য কথা বললেন যেন আমার মধ্যে কি একটা নিশ্চিত পরিবর্তন ঘটে গেল। সেখান থেকে যখন বেরিয়ে এলুম, মনে হচ্ছিল আমার বয়স কুড়ি বছর কমে গেছে, নূতন সত্যবিশ্বাসে এবং জীবনযুদ্ধে নামবার জন্য আশায় ভরে উঠেছে আমার মন।" মেয়ে ভক্তদের সম্বন্ধে মহারাজের খুব উঁচু ধারণা ছিল, বলতেন, "মেয়েদের অতি সহজেই দর্শনাদি হয়। একটু সাধনভজন করলেই তাদের ভাব ভক্তি খুলে যায়। তাদের ভাব ভক্তির জোর বেশী।" মেয়েদের কারও কারও দিব্যদর্শনের কথা শুনে তিনি নিজেই আশ্চর্য বোধ করতেন অনেক সময়ে। বলতেন, "আসল হচ্ছে ব্যাকুলতা।" শিষ্যদের তিনি কেবল পারলৌকিক মঙ্গলসাধন করতেন না, গৃহী ভক্তদের আর্থিক ক্লেশ দূর করবারও চেষ্টা করতেন, অনেক সময়ে চাকরী বা উপার্জনের উপায় বলে দিতেন। সকলের প্রতি প্রেম ও সমবেদনা ছিল তাঁর। অভিনেত্রী তারাসুন্দরী, এমন কি অজ্ঞাতনাম্নী এই শ্রেণীর বহু নারী, তাঁর কৃপায় ধন্য হয়ে গেছে। বদলে গেছে তাদের জীবন। অন্যের ছোটোখাটো দোষ তিনিই উপেক্ষা করতেন, শিষ্যদেরও করতে বলতেন। ঠাকুরের কথার উদাহরণ দিয়ে বলতেন, "যে সয়, সে রয়; যে না সয়, সে নাশ হয়।"

একুশ

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের দুর্গাপূজার সময় ভুবনেশ্বরে মঠ তৈরির কাজ শেষ হয়েছে শুনে মহারাজ সদলে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ৩১শে অক্টোবর মঠের দ্বারোদ্‌ঘাটন হ'ল। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন থেকে অবিলম্বে দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-কেন্দ্র এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ও খোলা হ'ল সেখানে। মহারাজ ভুবনেশ্বরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলতেন, "ভুবনেশ্বর শিবক্ষেত্র, গুপ্ত কাশী বলে জানবে। এখানে একটু সাধন করলে অনেক ফল পাওয়া যায়। ধ্যান সহজেই জমে। এমন স্বাস্থ্যকর স্থান—ছেলেরা অন্য জায়গায় খেটেখুটে আসবে, এখানে তাদের স্বাস্থ্য ভাল হবে আর সাধনভজনে লেগে যাবে।" মোট কথা, ভুবনেশ্বরের মঠ সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উন্নতির জন্যই বিশেষভাবে নির্মিত হ'ল। নানা-দেশের ফলফুলের গাছ এনে লাগালেন মহারাজ; বিস্তৃত জমি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হ'ল। দেশদেশান্তর থেকে অতিথি এবং ভক্তেরা আসতেন; তাঁদের জন্যও কয়েকটি বাড়ী তৈরি হ'ল, কাঁকুরে মাটি অচিরে শ্যামল হ'ল রাজা মহারাজের চেষ্টায়; ফুলেফলে, লতায় পাতায় সুশোভিত হ'ল মঠের বহিরঙ্গ। তপোবনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'য়ে সবাই বলাবলি করত, "এমনটি উড়িষ্যায় নেই।" রাজা মহারাজ বলতেন, "গাছপালায় জল দিলে তারা ফলফুল দিয়ে আশীর্বাদ করে।"

মাঠে বেড়াতে বেড়াতে বলতেন, "এই সব খোলা মাঠ দেখলে মনটা আপনাআপনি উদার ও মহৎ হয়, তাঁর চিন্তা আসে।" ভুবনেশ্বর মঠে পরবৎসর খুব সমারোহ ক'রে কালীপূজো হ'ল।

মহারাজ এখানে থাকতেই ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বামী অদ্ভূতানন্দের মৃত্যুসংবাদ এল। অত্যন্ত আঘাত পেলেন মহারাজ। যে মাসে খবর এল ঠাকুরের পরমভক্ত বলরাম বাবুর পুত্র রাম বা খুব অসুস্থ; তারপর এল তাঁর অকালমৃত্যুর সংবাদ। শোকের পর শোকের আঘাত আসতে লাগল। ২১শে জুলাই রাত্রি একটার সময় একজন লোক তাঁর ঘরে ঢুকে দেখেন, তিনি চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে ইজিচেয়ারে বসে আছেন; তাঁর কিছু প্রয়োজন আছে কিনা, প্রশ্ন করে উত্তর পেলেন না। গম্ভীরমুখে বসে রইলেন মহারাজ। সকালে বেড়াতে বেরুলেন না, বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। পরে তারে খবর এল, রাত্রি দেড়টার সময় শ্রীশ্রীমা মহাপ্রয়াণ করেছেন। মহারাজের মুখ অব্যক্ত বেদনায় থমথম করতে লাগল; তিন দিন কারো সঙ্গে কথা বলতে পারলেন না তিনি। বারো দিন খালি পায়ে রইলেন, হবিষ্যান্ন খেলেন।

ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতায় ফিরে মহারাজ কিছুদিন মঠের বৈষয়িক ব্যবস্থা এবং সাধুদের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করলেন। তাঁর মন অধিকাংশ সময়েই অপার্থিব রাজ্যে বিচরণ করত; তাই ইদানীং তাঁকে সভাসমিতিতে ডাকতে গেলে তিনি সহজে আসতে চাইতেন না। কিন্তু অনুরোধ, উপরোধ ক'রে একবার তাঁকে মন্ত্রণাসভায় বসাতে পারলে তাঁর প্রখর বুদ্ধি দেখে অবাক হ'তেন তাঁর ধর্মবন্ধুরা এবং উকিল-অ্যাটর্নিরা।

মঠ-মিশনের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট ; কিন্তু নিজের জীবনেও যেমন, সংঘের জীবনেও তেমনি। একবার কলিকাতার একজন পুত্রশোকাতুর ধনী ব্যবসায়ী মঠের কাছে বাস করে এবং মঠবাসীদের কল্যাণ-প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা আয়ের সমস্ত ব্যবসায়টি সাধারণের উপকারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে দান করতে চাইলেন। স্বামী প্রেমানন্দজীর মুখে সেই কথা শুনে মহারাজ সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, "বাবুরাম-দা, সাধুসঙ্গ ক'রে লোকটির মনে বৈরাগ্যের উদয় হল, আর তার সঙ্গ করে আমাদের বিষয়বুদ্ধি হবে ?" প্রস্তাবটির ইতি হল সেইখানেই।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর জানবাজারের 'কলিকাতা ছাত্রনিবাসে' সাধুদের নিয়ে মহারাজ সারাদিন উৎসবানন্দে কাটিয়েছিলেন। সেইরকম ছাত্রাবাস জেলায় জেলায় করার এবং সেইসঙ্গে শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করার কথাও তিনি বলেছিলেন সেদিন। চরিত্রগঠন এবং স্বাবলম্বনই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে, এই ছিল তাঁর মত। ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে কাশী সেবাশ্রমের জনৈক সেবককে তিনি ক'লকাতায় ডেকে পাঠান কাশীর খবর জানবার জন্য। সেবকটি যেদিন এসে পৌঁছুলেন, সেদিন রাজা মহারাজ কুচবিহারের মহারাজার আলিপুরের বাড়ীতে শৌর্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের অতিথি হয়েছেন। সেবকটি সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। সেবাশ্রম এবং অদ্বৈতাশ্রম সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে মহারাজ। পরে বললেন, "আমি কাশী যাব, তুই ব্যবস্থা কর।" মহারাজের কাশী যাওয়ার কথা সেবকটির মুখে শুনে স্বামী সারদানন্দও

যেতে চাইলেন, কিন্তু তিনি রাজা মহারাজের সঙ্গে গেলেন না, আলাদা ব্যবস্থা করলেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর জন্মতিথির কিছুদিন পূর্বে রাজা মহারাজের শেষবার কাশীতে আগমন হয়। আশ্রমের কাজ সুশৃঙ্খল-ভাবে চলছে না দেখে দুঃখ পেলেন তিনি। বুঝলেন, এর মূলে আছে কারও প্রভুত্বস্পৃহা এবং অন্যদের অভিমান। মহারাজ কাউকে তিরস্কার করলেন না, কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করলেন না; নিজে এমনভাবে কাজে মেতে গেলেন, নিরহঙ্কার সেবার আদর্শ এমনভাবে তুলে ধরলেন সকলের সামনে, এমন একটা আধ্যাত্মিক আবহাওয়া সেখানে গড়ে তুললেন সাধন-ভজনের মধ্য দিয়ে যে, আশ্রমের সমস্ত অন্তর্বিরোধ কোথায় তলিয়ে গেল। মহারাজের সঙ্গগুণে আবার সমস্ত আশ্রমবাসী মতভেদ ভুলে ঠাকুরের পূজা-বেদীতে ধর্মার্থে আত্মনিবেদনের সঙ্কল্প নিলে। নিঃশব্দে ঘটল এই বিস্ময়কর পরিবর্তন; চতুর সেনাপতি যুদ্ধে জয়লাভ করলেন বিনা অস্ত্রে। সেবার প্রায় চার মাস কাশীতে ছিলেন মহারাজ। আশ্রমের জন্য অনেকগুলি নিয়ম তিনি বিধিবদ্ধ করে এসেছিলেন। বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়ে তিনি প্রায়ই দিব্যভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। একদিন ঝাড়ুদারের হাত থেকে ঝাড়ু টেনে নিয়ে মন্দিরের উঠান ঝাঁট দিতে লেগে গিয়েছিলেন মহানন্দে। অন্নপূর্ণার মন্দিরে কালীকীর্তন বেশ জমেছিল সেদিন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের জন্মতিথিতে, স্বামীজীর জন্মতিথিতে এবং নিজের জন্মতিথিতে তিনি অনেক ব্রহ্মচারী সেবককে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। তারপর এপ্রিল মাসে ক'লকাতায় ফিরে এসে যে

মাসে তিনি মাদ্রাজ ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্‌ঘাটনের জন্য রওনা হলেন। পথে ভুবনেশ্বর মঠ এবং ওয়ালটেয়ার হ'য়ে মাদ্রাজ পৌঁছুলেন তিনি। শুভদিনে মহাসমারোহে ছাত্রাবাসের গৃহপ্রবেশ-উৎসব হ'ল, রাজা মহারাজ সেদিন নিজে ঠাকুরের পূজা করলেন। ছাত্রাবাসে কিছুদিন কাটিয়ে জুন মাসে তিনি বাঙ্গালোর মঠে গেলেন। শরৎকালে তিনি মাদ্রাজে ফিরে এলেন এবং ক'লকাতা থেকে প্রতিমা আনিয়ে দুর্গাপূজা এবং কালীপূজা করলেন। প্রতিমা দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন তিনি; ব্রাহ্মণ, শূদ্র এক পঙ্‌ক্তিতে বসে প্রসাদ পেলে পূজামণ্ডপে। তারপর রাজা মহারাজ শিবানন্দজীর সঙ্গে ভুবনেশ্বরে ফিরে এলেন ডিসেম্বর মাসে। এই সময় সর্বদাই যেন তাঁর ভেতরে আনন্দের ফোয়ারা ছুটত, সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন জ্যোতি বিচ্ছুরিত হ'ত। সেবক পদসেবা করতে গিয়ে ভাবত, এই দিব্যদেহ কি মাখন দিয়ে গড়া? সেই আনন্দসাগরের তীরে যে যেত, তারই মন ভরে উঠত এক অজানা আনন্দে। তাঁর সান্নিধ্য ও সেবার আনন্দ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

যতক্ষণ যেখানে যাদের কাছে থাকতেন, কত স্নেহ, কত আদর তাদের! দীনতম ভক্ত ও হীনতম দর্শনার্থীর মঙ্গলের জন্য কি ব্যাকুলতা! সকলকে উৎসাহ দিচ্ছেন, "ডুবে যা, লেগে যা, আমি পেছনে আছি, ভয় কি?" বলছেন, "তোমরা বুঝি ভেবেছ যে আগে অনুরাগ ও ভক্তিবিশ্বাস হোক, তারপর ডাকবে? তা কি কখনও হয়? অরুণোদয় না হলে কি আলো আসে? তিনি এলেই প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে আসবে। তাঁকে জানবার জন্যই তপস্যা।" . . . "তাঁর দিকে মন যত বেশী যাবে, আনন্দ তত বেশী

হবে। আর সংসারের দিকে, ভোগের দিকে, মন যত বেশী যাবে, ততই দুঃখকষ্ট বেশী হবে।" . . . "খুব জপ কর বাবা, খুব জপ কর। কলিতে জপই হচ্ছে সহজ উপায়। 'কাম জয় করব, ক্রোধ জয় করব' বলে চেষ্টা করে রিপু জয় করা যায় না। ভগবানে মন দিলে ওসব আপনা থেকেই কমে যায়। ঠাকুর বলতেন, 'পূর্বদিকে এগুলে পশ্চিমদিক আপনা থেকেই পেছনে পড়ে থাকে, কোন চেষ্টা করতে হয় না।' " অবিশ্বাসীর মনে বিশ্বাস জাগাবার জন্য বলেছেন, "কিছু করো, চার বৎসর অন্ততঃ সাধন ভজন করে দেখ দেখি। যদি কিছু না হয় তবে আমার গালে একটা চড় মেরো।" কত বড় আশ্বাসের কথা, কতখানি প্রাণের দরদ থাকলে এমন কথা বলা যায় !

বাইশ

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্বামী শিবানন্দের বিশেষ অনুরোধে রাজা মহারাজ ভুবনেশ্বর থেকে বেলুড়ে এলেন। এবার তিনি খুব দরাজ—যে চাইছে তাকেই দীক্ষা দিচ্ছেন। মঠের কুড়ি জন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দিলেন একসঙ্গে। আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হ'য়ে উঠল মঠ, গেরুয়ার ধূম লেগে গেল।

মঠে তেমন সুস্থ বোধ করছিলেন না মহারাজ, তাই কলকাতার বলরামমন্দিরে এসে থাকতেন মাঝে মাঝে। সেই সময় একদিন ঠাকুরের ভাইপো রামলাল চাটুয্যেমশাই (সাধু ভক্তদের রামলাল দাদা) এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বড় রসিক পুরুষ ছিলেন রাম-লাল, ঠাকুরের প্রিয় অনেক গান তিনি গাইতে পারতেন রস দিয়ে। মহারাজ তাঁকে ধরলেন, ঢপওয়ালী সেজে ঠাকুরের সময়কার গান শোনাতে হবে। প্রথমে তিনি কিছুতে রাজী হন না, কিন্তু মহারাজের অনুরোধ এড়ানো অসম্ভব। শেষে বলরাম বাবুর বাড়ীর মেয়েদের শাড়ী ও গহনা প'ড়ে বড় হলটায় আসর বসল, গান হ'ল সন্ধ্যেবেলায়। রামলাল হাত নেড়ে কীর্তনের সুরে গাইলেন, "একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত।" গানের মধ্যে যখন এই জায়গাটি এল, "যদি বল ব্রজে যেতে চরণেতে ধূলা লাগবে। . . . আগে রাখাল ছিলে, এখন রাজা হয়েছ, না হয় ব্রজগোপীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে।"

তখন রামলাল দাদা রাজা মহারাজের দিকে চেয়ে আখর দিয়ে বারবার বলতে লাগলেন, "আগে রাখাল ছিলে, এখন রাজা হয়েছ।" রাজা মহারাজ এতক্ষণ হাসিমুখে কীর্তন শুনছিলেন, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন, তাঁর মন যেন কোন অপার্থিব লোকে চলে গেল—অতীতের ব্রজগোপীদের আকুল আহ্বান বহন ক'রে নিয়ে এল যেন সেই গানের সুর। সত্যিই তিনি রাখাল ছিলেন, রাজা হয়েছেন। ঠাকুর এক সময়ে বলেছিলেন, তাঁর স্বরূপ জানলেই তিনি দেহ ছাড়বেন। তাই ঠাকুরের মুখে যাঁরা পদ্মের উপর নৃত্যরত রাখালরাজের প্রথম দর্শনের কথা শুনেছিলেন, তাঁর নিষেধ থাকায় তাঁরা কেউ কোনদিন সেকথা বলেন নি মহারাজকে। এতদিন পরে বুঝি রুদ্ধ উৎসের মুখ খুলে গেল, স্বরূপ দেখতে পেলেন মহারাজ।

অতঃপর স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি আঁটপুরে গেলেন মহারাজ কয়েকদিনের জন্য। সেখানে একটি বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন করে এবং শিবরাত্রি কাটিয়ে তিনি বেলুড়ে ফিরলেন। খুব সমারোহ করে ঠাকুরের তিথিপূজা এবং মহোৎসব হ'ল। তারপর তাঁর শরীর ভালো থাকছে না দেখে ক'লকাতায় যাওয়ার কথা হ'ল। যাওয়ার দিন সকালে মঠের সন্ন্যাসীদের সকলকে ডেকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন—স্বামীজীর সংকল্প ছিল, এখানে যেন ঠাকুরের শ্রীমন্দির তৈরি হয়; মহাপুরুষের সেই সংকল্প কাজে পরিণত হওয়া দরকার। মন্দিরের জন্য স্বামীজীর আমলের যে নক্সাটি তৈরি হয়ে আছে, সেটি আনিয়ে রাজা মহারাজ সকলকে দেখালেন, মঠবাসীদের এই গুরুদায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন মঠ থেকে। কে জানত সেই তাঁর চির বিদায়!

ক'লকাতায় বলরামমন্দিরে পৌঁছে মহারাজ দু'দিন খুব আনন্দ করলেন ভক্তদের নিয়ে। ১০ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ হঠাৎ তাঁর কলেরা হ'ল। সকলের পরামর্শে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হ'ল, ফল পাওয়া গেল তাতে। রোগ-যন্ত্রণা কম্‌ল, অন্নপথ্য করলেন মহারাজ। সকলের মন আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, এমন সময় বহুমূত্র বেড়ে গেলো। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হল এবার, তারপর কবিরাজী চিকিৎসার প্রস্তাব হল। রাজা মহারাজ রহস্য করে বললেন, "হাকিমিটা আর বাকী থাকে কেন?" কখনও গভীর অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা করেন, আবার কখনও সদানন্দ শিশুর মতো হেসে হাসিয়ে বাড়ী মাত করে দেন। ছিলেন দক্ষিণের ছোটো ঘরে, ইচ্ছা হল হলঘরে যাবেন। শিষ্যসেবকেরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে; মহারাজ বুঝতে পারছেন, নিজের ওজনটি তো কম নয়। হেসে বললেন, "ওরে, এখনও মরা হাতী লাখ টাকা।" সকলে হেসে উঠল তাঁর কথায়।

কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মশায় হাত দেখতে এসে ভাবছেন। মহারাজ চোখ বুজেছিলেন, চোখ খুলে চাইলেন। কবিরাজ মশায় ভক্তলোক, সকালে পূজাপাঠ সেরে কপালে বিভূতি-ধারণ করে বেরিয়েছেন। রাজা মহারাজ বললেন, "কবিরাজ মশায়, কপালে যাঁর চিহ্ন ধারণ করেছেন, সেই শিবই সত্য, আর সব মিথ্যা।" কবিরাজ অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন তাঁর কথা শুনে, তারপর নাড়ী দেখে ওষুধের ব্যবস্থা করে বিদায় নিলেন। শিষ্যসেবক এবং গুরুভাইদের উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে দিন কাটতে লাগল। ২৫শে চৈত্র শনিবার দুপুরে বলরাম বাবুর মেয়েদের কাঁদতে দেখে অভয় দিলেন রাজা মহারাজ, আশীর্বাদ করলেন সবাইকে। তারপর আশেপাশে

কাকে যেন খুঁজতে লাগলেন, মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন, "রামের মাকে ডাক তো।" আপন মনে বিড় বিড় করে কথা বলতে লাগলেন কার সঙ্গে। সন্ধ্যার পর ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, "কি কষ্ট হচ্ছে?" মহারাজ বললেন, "সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতিকারপূর্বকম্"—আমার অবস্থা এখন এইরকম, তোমরা এইটি ধারণা কর।" হঠাৎ রোগযন্ত্রণা ভুলে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন মহারাজ, এক অপার্থিব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখখানি। অনেকক্ষণ বাহ্যজ্ঞানশূণ্য হয়ে রইলেন। রাত ন'টার পর শিষ্যসেবকদের ডেকে কাছে বসালেন।

এক অদ্ভুত প্রেমবিগলিতভাব তখন মহারাজের; অর্ধজড়িত স্নেহকোমল কণ্ঠে প্রত্যেকের নাম ধরে তাদের আশীর্বাদ করলেন, অভয় দিলেন; বললেন, "ভয় কি বাবা, তোদের? তোরা ভগবানকে ভুলিস নি, তোদের কল্যাণ হবে।" . . . "ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা"—বলতে বলতে আবার কখন নিজের অন্তরের গভীরে ডুব দিয়েছেন। মধুর স্বরে অর্ধনিমীলিত নয়নে বলছেন, "ব্রহ্মসমুদ্রে বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে ভেসে যাচ্ছি। এই যে বিবেক, বিবেক, বিবেকানন্দ দাদা এসেছ? এই যে বাবুরাম-দা, বাবুরাম-দা! যোগেন, যোগেন!" পরলোকগত গুরুভাইদের দেখতে পাচ্ছেন চারদিকে, আত্মহারা হয়ে গেছেন মহারাজ। নিজের মনে বলছেন মুগ্ধ বিস্ময়ে, "আহা-হা! ব্রহ্মসমুদ্র! ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ। পরমাত্মনে নমঃ।" অনেক অপার্থিব গূঢ় অনুভূতির কথা বলতে বলতে রুদ্ধ হয়ে আসছে তাঁর কণ্ঠ। একজন সেবক গলা শুকিয়ে এসেছে ভেবে বললেন, "একটু লেমনেড দিই?" মহারাজ ধীরে ধীরে বললেন, "রোস্, আগে বস্তু ঠিক করে নি। মন যে ব্রহ্মলোক থেকে নামতে

চায় না। দে, ব্রহ্মে লেমনেড ঢেলে দে।" পরে বিদ্রূপের স্বরে বললেন, "আচ্ছা, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম করছি, আবার লেমনেড লেমনেড করছি কেন?" সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠল তাঁর কথায়। স্বামী শিবানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ কাছেই ছিলেন, শোকার্ত্ত মৌন তাঁরা। স্বামী সারদানন্দও কাছে থাকতেন সারাদিন, রাত্রে শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে শুতে যেতেন, তিনি খবর পেয়ে রাত্রেই এলেন। তাঁকে দেখে রাজা মহারাজ বললেন, "ভাই শরৎ, আমার যে ব্রহ্মবেদান্ত গোল হ'য়ে গেল। তুমি তো ব্রহ্মবিদ্যা জান, কি বল দিকি?" সারদানন্দ বললেন, "তোমার আবার গোল কি, মহারাজ? ঠাকুর তো তোমায় সব করে দিয়েছেন!" রাজা মহারাজ বলে উঠলেন, "ঠাকুর সত্য, তাঁর লীলাও সত্য। হাঁ, আমি প্রায় গিয়েছি, কেবল একটু বাকী। ব্রহ্মতিমির।" বিভোর হ'য়ে রইলেন অনেকক্ষণ আবার। কোন্ ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দরস পান করতে করতে এক আশ্চর্য দিব্য প্রশান্তির ভাব ফুটে উঠল তাঁর মুখে। ঘরশুদ্ধ সকলে অপেক্ষা করছেন, সকলের মনের উদ্বেগ, আতঙ্ক, সব যেন চাপা পড়ে গেছে। মহাপুরুষের সেই দিব্যভাব যেন বিচ্ছুরিত হয়ে সকলকে প্রভাবিত করেছে, আত্মহারা হয়ে গেছেন সবাই। সেই নিস্তব্ধ কক্ষ সহসা ধ্বনিত হয়ে উঠল রাজা মহারাজের মধুর উচ্চ কণ্ঠস্বরে। তিনি বলে উঠলেন, "এই যে পূর্ণচন্দ্র রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই! আহা-হা! এক প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর একটি সুন্দর ছেলে দাঁড়িয়ে। আমি ব্রজের রাখাল। দে, দে, আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দে, আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচব। ঝুম্ ঝুম্ ঝুম।"

গুরুভাইরা বুঝতে পারছেন সময় ফুরিয়ে আসছে। ঠাকুরের

ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, "যে সময় রাখাল কমলে কৃষ্ণকে দেখতে পাবে, সেই সময়েই জীবনান্ত হবে তার।" রাজা মহারাজ একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, "কৃষ্ণ এসেছে। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ! তোরা দেখতে পাচ্ছিস নি? তোদের চোখ নেই! আমার কমলে কৃষ্ণ—পীতবসন কৃষ্ণ! আহা-হা, কি সুন্দর! আমার ব্রজের কৃষ্ণ, কষ্টের কৃষ্ণ নয়। এবারের খেলা শেষ হ'ল। ছাখ, ছাখ, একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলোচ্ছে আর বলছে, 'আয়, চলে আয়'।" ব'লতে ব'লতে নীরব হয়ে গেলেন রাজা মহারাজ—মহাধ্যানে ডুবে গেলেন। সে ধ্যান আর ভাঙল না তাঁর। রবিবার এইভাবেই কাটল। সোমবার রাত্রি আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় মহাধ্যান মহাসমাধিতে পরিণত হ'ল। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রামকৃষ্ণসংঘনায়ক সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ রাজা মহারাজ ব্রজের রাখালরূপে ফিরে গেলেন তাঁর নিত্য লীলার ক্ষেত্রে। তাঁর ধ্যানের ধন, প্রাণের ঠাকুর সখার বেশে এসে নিয়ে গেলেন তাঁকে তাঁর সদানন্দ অমৃতলোকে।

পরদিন বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে তাঁর পুণ্যদেহ আহুতি দেওয়া হ'ল চিতাগ্নিতে।

চলে গেলেন রাজা মহারাজ। দেবতার দীপ—ঈশ্বরের বাণী-বহন ক'রে যাঁরা আসেন পৃথিবীর ধুলায়, সময় ফুরলে পৃথিবীর ধুলাতেই রেখে যেতে হয় তাঁদের পার্থিব দেহ। কিন্তু যে মঙ্গল দীপশিখা তাঁরা তপস্তাপূত জীবন দিয়ে জ্বালিয়ে রেখে যান, সে তো নেবে না! যুগ যুগ ধরে সেই অনির্বাণ দীপালোক পথ দেখায় পথভ্রান্ত মানুষকে, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসে কাতর জিজ্ঞাসুকে। সার্থক

তাঁদের জীবন, মৃত্যুর পথেই অমরত্বের অধিকারী হন তাঁরা। দুর্ভাগ্য তারা, যারা তাঁদের কাছে পেয়েও চিনলে না, কাজে লাগালে না তাঁদের অমূল্য উপদেশ, মূল্য দিলে না তাঁদের সীমাহীন প্রেমলাভের সৌভাগ্যকে।

আকাশের চাঁদ জলে ছায়া ফেলে; ঝিকঝিক করে জলের মধ্যে তার তরল মাধুর্য। মাছেরা খেলা করে তার সঙ্গে, মনে করে এ বুঝি আমাদেরই একজন। তারা কি বুঝতে পারে, এ চাঁদ তাদের চিরদিন থাকবে না? তারা কি ভাবতে পারে, এ চাঁদ আকাশের, জলের নয়?

কালিন্দীফুল্লকমলে মাধবেন ক্রীড়ারত।
ব্রহ্মানন্দ নমস্তভ্যং সদ্‌গুরো লোকনায়ক॥

ওঁ তৎ সৎ ওঁ